পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন

ক্ষমতা দখলের লোভ বনাম দেশ গড়ার স্বপ্ন

পৃঃ ২৮

দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

তিনসুকিয়ার ঘটনা অসমকে কাশ্মীর বানানোর ষড়যন্ত্রের অঙ্গ

—পৃঃ ১০

৭১ বর্ষ, ১১ সংখ্যা।। ২৬ নভেম্বর ২০১৮।। ৯ অগ্রহায়ণ - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন

প্রাথমিকভাবে এগিয়ে বিজেপি

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ১১ সংখ্যা, ৯ অগ্রহায়ণ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

২৬ নভেম্বর - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

ছত্তিশগড়-মধ্যপ্রদেশে রাহুল গান্ধীর শত অপপ্রচারেও বিজেপির দুর্গে ফাটল ধরেনি □ গূঢ়পুরুষ □ ৬

খোলা চিঠি : সাফ কথা, সিবিআই-টিবিআই চলবে না □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

রাহুল গান্ধীর মিথ্যাচার গোয়েবলসকেও হার মানায় □ জি বি রেড্ডি □ ৮

তিনসুকিয়ার ঘটনা অসমকে কাশ্মীর বানানোর ষড়যন্ত্রের অঙ্গ □ সাধন কুমার পাল □ ১০

আত্মপ্রচারের ঢক্কানিনাদ আর সুযোগসন্ধানী রাজনীতিই মমতার সম্বল □ সনাতন রায় □ ১৩

জিহাদের হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করতে হবে □ আর এন দাস □ ১৫

হেফাজতে ইসলাম এখন আওয়ামি লিগের বন্ধু, ইসলামিকরণে তারাই হবে হাতিয়ার □ ১৭

গ্যাস নিয়ে বিষাক্ত ‘গ্যাস’ ছড়ানো হচ্ছে □ সুব্রত দত্ত□ ১৮

পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন : প্রাথমিকভাবে এগিয়ে বিজেপিই □ রন্তিদেব সেনগুপ্ত □ ২৪

হার নিশ্চিত বুঝে মধ্যপ্রদেশে দিশেহারা কংগ্রেস □ ড. জিষ্ণু বসু □ ২৭

পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন : ক্ষমতা দখলের লোভ বনাম দেশ গড়ার স্বপ্ন □ চন্দ্রভানু ঘোষাল □ ২৮

নিত্যানন্দ পার্ষদ পুরন্দর পণ্ডিত □ তমালকৃষ্ণ মহান্ত □ ৩১

কার্তিক সংক্রান্তির ব্রত □ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী □ ৩৩

গল্প -১ : আঁধার পেরিয়ে □ রূপশ্রী দত্ত □ ৩৫

গল্প -২ : গন্ধ □ রঞ্জিত কুমার ভরদ্বাজ □ ৩৬

গল্প -৩ : সুপারি কিলার □ সন্দীপ চক্রবর্তী □ ৩৭

ভারতে নারী জাগরণের অগ্রদূত সাবিত্রীবাই ফুলে □ চিন্ময় সেনগুপ্ত □ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ **অঙ্গনা : ২১** □ **সুস্বাস্থ্য: ২২** □ **সমাবেশ-সমাচার : ২৩** □ **নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯** □ **চিত্রকথা : ৪০** □ **খেলা : ৪১**□ **অন্যরকম : ৪২** □ **রঙ্গম : ৪৯** □ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৩ডিসেম্বর ২০১৮

প্রকাশিত হবে ৩ডিসেম্বর ২০১৮

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

রাফাল নিয়ে রাজনীতি

রাফাল যুদ্ধবিমান নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। বলা বাহুল্য, এই বিতর্ক আগাগোড়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রসূত। এর সঙ্গে সত্যের কোনও সম্পর্ক নেই। সামরিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত, যদি কোথাও কোনও সত্য থাকতো তা হলে রাহুল গান্ধী এবং তার অনুচরেরা বিতর্কটি পার্লামেন্টে উত্থাপন করতেন। অথবা জনস্বার্থে মামলা দায়ের করতেন। এসব কিছুই না করে তিনি ভুল বুঝিয়ে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে মানুষকে খেপানোর রাজনীতি করছেন। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয় — রাফাল নিয়ে রাজনীতি। লিখছেন সৌভিক রাতুল বসু, অভিমন্যু গুহ প্রমুখ।

।। দাম একই থাকছে— দশ টাকা মাত্র।।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name :

United Bank of India

Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

হতাশের নিষ্ফল আস্ফালন

মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে দলীয় ইস্তাহারে কংগ্রেস বলিয়াছে, ওই রাজ্যে ক্ষমতায় আসিলে তাহারা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিবে। তৎসহ সমস্ত রাজ্য সরকারি কর্মচারীর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহিত কোনওরূপ সংশ্রব রাখার উপরেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হইবে। কংগ্রেসের এই বক্তব্যকে এক কথায় বলা চলে, হতাশের নিষ্ফল আস্ফালন। শতবর্ষের প্রাচীন এই কংগ্রেস দলটি নেহরু-গান্ধী পরিবারের অপরিণামদর্শী নেতৃত্বের কারণে ক্রমশই এই দেশের মানুষের কাছে পরিত্যাজ্য হইয়াছে। এই দলটির দ্বিচারিতা দেশের মানুষ বুঝিয়া ফেলিয়াছে। অপরদিকে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হইয়া, দেশের মানুষের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হইয়াছে। সঙ্ঘের দেশপ্রেম, স্বদেশ ভাবনা এবং জাতীয়তার বাণী দেশের সর্বস্তরের মানুষ, বিশেষ করিয়া যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত করিতেছে। সর্বত্র সঙ্ঘের এই গ্রহণযোগ্যতাই কংগ্রেস নেতাদের কাছে বিষবৎ মনে হইতেছে। সেই সঙ্গে কংগ্রেস যতই ক্ষয়িষ্ণু হইতেছে, ততই কংগ্রেস নেতারা জনবিচ্ছিন্ন হইতেছেন, হতাশা তাঁহাদের গ্রাস করিতেছে। এই হতাশারই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়াছে মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে।

কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর প্রসাদধন্য যে কংগ্রেস নেতারা এই ইস্তাহারটি রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ। তাঁহারা জানেনেই না মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী হইতে লালবাহাদুর শাস্ত্রী—বহু কংগ্রেস নেতা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সম্পর্কে শ্রদ্ধার মনোভাবই পোষণ করিতেন। গান্ধীজী সঙ্ঘের শিবির পরিদর্শন করিয়া প্রকাশ্য সভায় সঙ্ঘের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের সময় সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিবার লক্ষ্যেই প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে তাহাদের অংশগ্রহণ করিবার আমন্ত্রণ জানাইয়াছিল ভারত সরকার। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী রাজধানী দিল্লির যান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দুঃস্থ-আর্তের সেবায় সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকগণ সর্বদাই অগ্রণী ভূমিকা লইয়াছেন। কেরলের সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যাই তাহার প্রমাণ। সঙ্ঘের এই গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা দেশবাসী জানে। অতএব, নেহরু-গান্ধী পরিবারের ভৃত্য স্বরূপ কিছু কংগ্রেস নেতা কী বলিলেন—তাহাতে কিছুই যায় আসে না।

সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিবার এই হুঙ্কার যে কংগ্রেস নতুন দিতেছে এমনও নয়। পূর্বে জওহরলাল নেহরু এবং ইন্দিরা গান্ধীও সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তবু সঙ্ঘকে তাঁহারা ধ্বংস করিতে পারেন নাই। সকল বাধা উপেক্ষা করিয়া, সকল আক্রমণ প্রতিহত করিয়া সঙ্ঘ তাহার আপন শক্তিতে বিকশিত হইয়াছে। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ইহাও জানেন, এইবারও তাঁহাদের হুঙ্কার কার্যত কাগুজে বাঘের বাণীতেই পর্যবসিত হইবে। কেননা, নির্বাচনী ইস্তাহারটি কার্যকর করিবার সুযোগই তাঁহাদের জুটিবে না। তাহার আগেই, এই বিধানসভা নির্বাচনেই, মধ্যপ্রদেশের ভোটদাতারা কংগ্রেসকে কুলার বাতাস দিয়া বিদায় করিবেন।

সুভাষিতম্

মেরুশ্চলতি কল্পান্তে মর্য্যাদা সাগরস্য চ।
প্রতিপন্নমহাসত্ত্বাঃ ন চলন্তি কদাচন।। (চাণক্য নীতি)

কল্পান্তে মেরুপর্বত ধ্বংস হয়, সাগরও তার সীমা অতিক্রম করে। কিন্তু মহান সত্তা মহাপুরুষদের চিত্তবৈকল্য কখনই ঘটে না।

ছত্তিশগড়-মধ্যপ্রদেশে রাহুল গান্ধীর শত অপপ্রচারেও বিজেপির দুর্গে ফাটল ধরেনি

ছত্তিশগড়ে দু' দফায় বিধানসভার নির্বাচন শেষ হয়েছে। মাওবাদীদের ভোট বয়কটের ডাক উপেক্ষা করে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচনে যোগ দিয়েছেন। তাই ছত্তিশগড়ের বীরপুত্রদের সেলাম জানাতেই হবে। ভারতের গণতান্ত্রিক সমাজ ও শাসন ব্যবস্থার শত্রু মাওবাদীরা গুপ্ত হত্যার রাজনীতি করে। এদের ক্ষমা করা যায় না। ক্ষমা করা উচিত নয়। ছত্তিশগড়ের নির্বাচনের বিপুল ভোট শতাংশ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সেখানে মাওবাদীরা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। ছত্তিশগড়ে চতুর্থবার ক্ষমতায় ফিরলে বিজেপির প্রথম ও প্রধান কাজ হবে বস্তার জেলা থেকে মাওবাদীদের সমূলে উৎখাত করা।

এবার ছত্তিশগড়ের ভোট হয়েছে দু' দফায়। ১২ এবং ২০ নভেম্বর। বিধানসভায় আসন সংখ্যা ৯০ + ১ বলতে বোঝাতে চাইছি যে একটি আসন মনোনীত প্রার্থীর জন্য। এই আসনে সরাসরি ভোট হয় না। ছত্তিশগড়ের ভোট দিয়ে শুরু হয়েছে দেশের পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভার ভোট। এই পাঁচ রাজ্যের ভোটের ফলাফল ইঙ্গিত দেবে বিজেপির পালে জনমতের হাওয়া কতটা জোরালো। আগামী ছয়-সাত মাসের মধ্যে লোকসভার নির্বাচন। এই নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, পর পর দু'বার বিজেপি কেন্দ্রে, পূর্ণ সময়ের জন্য শাসন ক্ষমতায় আসেনি, কংগ্রেস সাংগঠনিকভাবে এতটাই দুর্বল যে একক ক্ষমতায় কেন্দ্রে সরকার গড়ার অবস্থায় নেই। আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে জোট গড়ে ক্ষমতা দখল করা ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই কংগ্রেসের। মিলিজুলি সরকার স্থায়ী হয় না। আঞ্চলিক দলেরা তাদের প্রভাবিত অঞ্চলের উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করবে। গোটা দেশের মানুষের স্বার্থে নয়। যেমন, মিলিজুলি সরকারে যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকেন তবে অবশ্যই তিনি নারদা-সারদা-সহ সমস্ত চিটফান্ডের দুর্নীতির তদন্ত বন্ধ করে দিতে চাপ দেবেন। রাজ্য সরকারের দেয় লক্ষ লক্ষ কোটি ঋণ মকুব করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করবেন। ঋণ মকুবের ধাক্কায় ভারতের অর্থনীতি ভেঙে পড়লেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু যায় আসে না। তৃণমূল নেত্রীর কাছে পশ্চিমবঙ্গই ভারত। ভারতের আর্থিক উন্নয়ন বলতে তিনি বাংলার উন্নয়ন বোঝেন। দেশের সমস্ত আঞ্চলিক দলের নেতৃত্বই এই পথের পথিক। অখণ্ড ভারত তাঁদের চিন্তায় নেই। নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থরক্ষাই আঞ্চলিক দলগুলির একমাত্র লক্ষ্য। এই স্বার্থ সংঘাতের জন্যই কেন্দ্রে মিলিজুলি সরকার স্থায়ী হয় না।

ছত্তিশগড় ছাড়া বাকি যে চারটি রাজ্যে ভোট হচ্ছে সেগুলি হলো— মিজোরাম, মধ্যপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা ও রাজস্থান। মিজোরাম এবং মধ্যপ্রদেশে ভোট হবে ২৮ নভেম্বর। এর মধ্যে মধ্যপ্রদেশ বড় রাজ্য। বিধানসভায় আসন সংখ্যা ২৩০ + ১। গত ১৫ বছর এখানে ক্ষমতায় আছে

গূঢ় পুরুষের

কলম

বিজেপি। একটা অদ্ভুত মিল আছে ছত্তিশগড় এবং মধ্যপ্রদেশের মানুষের চিন্তা, ভাবনা এবং মননে। ছত্তিশগড়ে যে দল জিতবে সেই দলই মধ্যপ্রদেশেও জিতবে। বিগত ১৫ বছর এমনটাই হয়ে এসেছে। ১৯৯৮ সালের বিধানসভার নির্বাচনে এই দুই রাজ্য একসঙ্গে ছিল। সেবার কংগ্রেস জিতেছিল। কিন্তু রাজ্য ভাগ হওয়ার পর পরপর তিনটি টার্মে বিজয়ী হয় বিজেপি। কংগ্রেস মাত্র ১ শতাংশ ভোট কম পেয়ে গতবার দ্বিতীয় স্থানে ছিল। এই দুই লাগোয়া রাজ্যের রাজনীতির একই চেহারা।

এবারও পরিস্থিতির বিশেষ হেরফের হয়নি। রাহুল গান্ধীর শত অপপ্রচারেও বিজেপির জনসমর্থনে ভাঁটা পড়েনি। উল্টে নিজের নাক কেটে কংগ্রেসের যাত্রাভঙ্গে মাঠে নেমেছেন ছত্তিশগড় রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজিত যোগী। দু'বছর আগে কংগ্রেস ছেড়ে তিনি নিজের দল গড়েছেন। ছত্তিশগড় জনতা কংগ্রেস। কংগ্রেস বনাম বিজেপির লড়াইতে তিনি বা তাঁর দল এবার তৃতীয় শক্তি। তাঁর দল একটি আসনও না পেলে ক্ষতি নেই। কংগ্রেস হারলেই তিনি খুশি। অজিত যোগী জোট করেছেন মায়াবতীর দল বিএসপি এবং সিপিআইয়ের সঙ্গে। দুটি রাজ্যেই তাঁরা ভোট কেটে কংগ্রেসকে হারাতে বদ্ধ পরিকর। ২০১৩ সালের ২৫ মে ছত্তিশগড়ের সুকমায় মাওবাদী হামলায় দুই রাজ্যের অধিকাংশ প্রথম সারির কংগ্রেস নেতারা খুন হয়ে যান। সেই শূন্যতা দুই রাজ্যের কংগ্রেস সংগঠনকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দিয়েছে। নিশ্চিতভাবে বিজেপি এবার ছত্তিশগড় এবং মধ্যপ্রদেশে চতুর্থবার ক্ষমতায় ফিরছে।

মিজোরাম বিধানসভায় আসন সংখ্যা মাত্র ৪০। গত ১০ বছর এখানে ক্ষমতায় আছে কংগ্রেস। এবার ক্ষমতা ধরে রাখা সম্ভব হবে না। মিজোরামে বিজেপি তার সাংগঠনিক শক্তি বিপুলভাবে বাড়িয়েছে। অসম এবং ত্রিপুরায় ক্ষমতা দখলের পর উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রভাব বাড়াতে একমাত্র বাধা মিজোরাম। এই রাজ্যে কংগ্রেসের পতন মানে সমগ্র উত্তর-পূর্ব বিজেপির দখলে। 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির সাফল্য সম্ভব হবে মিজোরাম জয়ে। তেলেঙ্গানা বিধানসভায় আসন আছে ১১৯ + ১। এখানে ভোট হবে ৭ ডিসেম্বর। এখানে এক নম্বর দল হচ্ছে তেলেঙ্গনা রাষ্ট্রীয় সমিতি (টি আর এস)। বিজেপি তেলেঙ্গনায় সাংগঠনিকভাবে দুর্বল। বরং টি আর এসকে হঠিয়ে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে ময়দানে নেমেছে তেলুগু দেশম পার্টি, কংগ্রেস, সিপিআই আর তেলেঙ্গনা জন সমিতির জোট। তেলেঙ্গানায় আদতে লড়াইটা হবে তেলেঙ্গনা রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রধান কে-চন্দ্রশেখর রাওয়ের সঙ্গে চন্দ্রবাবু নাইডুর তেলুগু দশমের মধ্যে।

অধিকাংশ সংবাদমাধ্যমের সমীক্ষা বলছে রাজস্থানে হাওয়া এবার কংগ্রেসের দিকে। রাজস্থানে কংগ্রেসের মুখ হিসেবে উঠে এসেছেন সচিন পাইলট। তবে বিজেপির সংগঠন বেশ শক্তপোক্ত। কিন্তু দলের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারছেন না মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে। শেষ কয়েকটি উপনির্বাচনে বিজেপির পরাজয় এ কথাই বলছে। সংগঠনের জোরে বিজেপি এখানে জোর লড়াই দেবে। সহজে হার মানবে না। তবে মনে রাখতে হবে যে রাজস্থানের ভোটে যদি বিজেপি জেতে তাহলে সামনের লোকসভার নির্বাচনে টিম-নরেন্দ্র মোদীর জয় নিশ্চিত। অন্যদিকে, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ আর ছত্তিশগড়ের তিনটিতেই বিজেপির পরাজয় বুঝিয়ে দেবে ২০১৯ সালটা শুভ নয়।

সাফ কথা, সিবিআই-টিবিআই চলবে না

মাননীয় অরুণ জেটলি,
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী,

আপনি অনেক কথা বলেছেন। অন্ধ্র নিয়েও বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ নিয়েও বলেছেন। কিন্তু সাফ কথা জেনে রাখুন সিবিআই-টিবিআই চলবে না। দিদির বাংলায় দিদিই শেষ কথা। তিনি যখন বলে দিয়েছেন চলবে না তখন চলবে না। ব্যাস। কথা শেষ।

আপনি দিদির উদ্দেশ্যে বলেছেন, ‘‘যাঁদের কিছু লুকোনোর আছে, তারাই সিবিআইকে রাজ্যে প্রবেশে বাধা দিচ্ছেন।’’ হ্যাঁ লুকোনোর আছে। দিদির অনেক কিছুই লুকোনোর আছে। দিদির ভাইপোরও আছে। আছে তো আছে! তা বলে তদন্ত হবে কেন! এটা কি মামার বাড়ির আব্দার নাকি! দিদির রাজ্যে ঢুকে দিদির স্বার্থের বিরুদ্ধে তদন্ত হবে আর দিদি চুপ করে দেখবেন নাকি!

১৯৪৬ সালে দিল্লি ‘স্পেশাল পুলিশ এস্ট্যাব্লিসমেন্ট অ্যাক্টে’র মাধ্যমে সিবিআই গঠিত হয়। ওই আইনেই সংস্থান ছিল যে, কোথাও তদন্ত করতে গেলে সংশ্লিষ্ট রাজ্য প্রশাসনের অনুমতি প্রয়োজন নেই সিবিআইয়ের। কেবলমাত্র সম্মতিই যথেষ্ট। ১৯৮৯ সালে তৎকালীন বাম সরকার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানায়, সিবিআই রাজ্যে স্বাধীনভাবে তদন্ত করলে তাদের আপত্তি নেই। সেই বিজ্ঞপ্তিই এতদিন বহাল ছিল। এবার তা খারিজ করে দিয়েছে রাজ্য মানে দিদি। অতএব খারিজ। দিদি চেয়েছেন তাই খারিজ করতেই হবে।

এমনিতেই দিদির সারদা, নারদা নিয়ে চিন্তার শেষ নেই। রোজভ্যালি, প্রয়াগ সেসব তো আছেই। আর সেগুলোর তদন্ত আবার হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে। সেগুলো তো কিছু করা যাবে না। কিন্তু এর পরে আর নয়। অনেক হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের পরে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে কেঁচো খুঁড়তে এসে একটাও কেউটে খুঁজে ফেলতে পারবে না সিবিআই। ঢুকতেই দেব না। সোজা কথা।

দিদি অবশ্য আগে বলেননি। নাইডু বন্ধুকে সমর্থন করেছেন। প্রথমে অন্ধ্রপ্রদেশে সিবিআই কোনও মামলার তদন্ত করতে পারবে না বলে জানান নাইডুবাবু। এ ব্যাপারে রাজ্যের তরফ থেকে যে সাধারণ সম্মতি দেওয়া থাকে তা প্রত্যাহার করে নেন। সরকারি কাজে রাজ্যে প্রবেশের জন্য আগে অন্ধ্র সরকারের কাছে অনুমতি নিতে হবে সিবিআই-কে। সেটা শুনেই জোড়হাত করে প্রথমে সমর্থন জানান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর পরের দিনেই নাইডুর দেখানো পথে হাঁটেন মমতা। অন্ধ্রের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গও সিবিআইয়ের প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

জেটলিবাবু আপনি হয়তো বলবেন, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা মানেই তো সে গোটা দেশে তদন্ত করবে। পশ্চিমবঙ্গ তো আর দেশের বাইরে নয়! না, সেসব যুক্তির ছেঁদো কথায় কান দেওয়ার সময় নেই আমাদের। একটাই কথা দিদি যখন বলেছেন ঢুকবে না তো ঢুকবে না।

আপনি সেদিন বলেছেন, ‘‘দুর্নীতির বিষয়ে কোনও রাজ্যের সার্বভৌম ক্ষমতা নেই। তাদেরই আছে শুধু, যারা অনেক কিছু লুকোতে চায়, তাই রাজ্যে সিবিআইকে ঢুকতে দিচ্ছে না।’’

আগেও বলছি, ফের বলছি। হ্যাঁ ভয় আছে। আর আছে বলেই ঢুকতে দেব না, যা পারার করে নিন।

তবে দিদির জন্য জানেন একটা ভয় পাচ্ছি। যদি আদালতের অনুমতি নিয়ে, নির্দেশ নিয়ে সিবিআই আসে তখন কোনও রাজ্যই তো আটকাতে পারবে না। প্লিজ, জেটলিবাবু দিদিকে এবার ছেড়েই দিন। সারদা, নারদা অনেক চাপ রয়েছে। নতুন করে আর চিন্তায় ফেলবেন না। সামনে শীতকাল। দিদি একটু মেলার মেজাজে থাকবেন। সেই সময়ে এমনটা করবেন না প্লিজ।

—সুন্দর মৌলিক

অতিথি কলম

জি বি রেড্ডি

রাহুল গান্ধীর মিথ্যাচার গোয়েবলসকেও হার মানায়

আজকাল Cyber war খুব চেনা শব্দ যার মাধ্যমে ইন্টারনেট থেকে তথ্য চুরি করে নেওয়া হয়। আজকাল সোশ্যাল মিডিয়া অত্যন্ত জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত একটি মাধ্যম হওয়ায় এর মাধ্যমে একটি নতুন যুদ্ধ শুরু হয়েছে যার পোশাকি নাম Lie war অর্থাৎ ঢেলে মিথ্যে চালান করা। নির্বাচকমণ্ডলীর অভিমত, ভাবনা চিন্তার স্বচ্ছতা তালগোল পাকিয়ে দিতে সমস্ত রাজনৈতিক দল উঠে পড়ে লেগেছে। সত্যকে ধামা চাপা দিতে সোশ্যাল মিডিয়া মিথ্যের তাণ্ডবে তোলপাড় হচ্ছে। কোথাও কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষমতায় থাকাকালীন শাসনের কোনও তুলনামূলক ভালো-মন্দ আলোচনার লেশমাত্র নেই।

অথচ সোশ্যাল মিডিয়া সম্পর্কে সচেতনতা ও এর প্রভাব সম্পর্কে কিন্তু অধিকাংশ মানুষেরই বিশেষ আইডিয়া নেই। আন্তর্জাতিক ফেস বুক সংস্থার সি ই ও মার্ক জুকেরবার্গ সম্প্রতি বিবৃতি দিয়ে বলেছেন সাধারণ মানুষ তো কোন ছার, বহু নীতি নির্ধারকরা নিজেরাই সোশ্যাল মিডিয়ার বিষয়ে অজ্ঞ। এদিকে শোনা যায় ফেসবুক ট্যুইটার এখন নিজের হিম্মতে রাজনৈতিক দল তৈরি বা ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা ধরে। বিশেষ বিশেষ দলগুলির নেটওয়ার্কের নিয়ন্ত্রণ কব্জা করে তারা জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতি-প্রকৃতির মোড় ঘুরিয়ে দিতেও আজ সক্ষম।

সোশ্যাল মিডিয়া আর মিথ্যে বিবৃতি :

এক দশকে ব্যাপক বাড়-বাড়ন্তের সুবাদে আজ যে কোনও ব্যক্তি বহু তথ্য তার নিজের আয়ত্তাধীন রাখতে পারে বা প্রয়োজনে মনোমতো ব্যক্তির সঙ্গে শেয়ারও করতে পারে। সবই ইন্টারনেটের মাহাত্ম্য। এর ফলে এই তথ্যাস্ত্র আজ নির্বাচনী ব্যালট বাক্সে বিপ্লব ঘটাবার ক্ষমতা ধরে। সেখানে পারমাণবিক বোমার প্রয়োজন হয় না। বাস্তবে সেই সব রাজনৈতিক নেতা বা দলই আজ নির্বাচনী পরীক্ষায় নিশ্চিন্তে উতরে যাওয়ার আশা করে যারা যত বেশি সঠিক তথ্য বা বেঠিক তথ্য নিজের সুবিধে মতো ব্যবহার করতে পারে। হ্যাঁ, এভাবেই তারা প্রতিদ্বন্দ্বীকে পেছনে ফেলে বা বোকা বানিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে।

তথ্য ভাণ্ডারে সঠিক তথ্য আজকাল সবচেয়ে বেশি যথাযথভাবে পাওয়া গেলেও সত্যকে মিথ্যার সমুদ্রে ডুবিয়ে মারতেই নোংরা রাজনীতি করতে অভ্যস্ত নেতারা সদা তৎপর। তথ্য-যোদ্ধাদের প্রধান জোরের জায়গা, যেন তেন প্রকারেণ তথ্যপুঞ্জকে ভাইর্যাল করে দাও। তা সে সংবাদভাষ্য, আবেকতাড়িত বাণী, কোনও সম্প্রদায় সংক্রান্ত বিষোদগার যাই হোক না কেন। এক্ষেত্রে পুরোধা হলেন রাহুল গান্ধী ও তাঁর শাকরেদরা। তাঁরা মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনুকরণে নিয়ম করে প্রতিদিন 'ট্যুইট অফেন্সিভ' বা ট্যুইট আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছেন। দেখেশুনে এমন বিশ্বাস জন্মাচ্ছে যে রাহুল গান্ধী ও তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ার শাকরেদদের সমাজে ঘৃণা উৎপাদন ও নিটোল মিথ্যার বিতরণ এমন বিকট মাত্রায় পৌঁছেছে যে হিটলারের প্রয়াত প্রচার বিশারদ গোয়েবলস হয়তো এঁদের কাছে হেরে যাওয়ার লজ্জায় আবার আত্মহত্যার কথা ভাবছেন। রাহুল ও বাহিনী এই আপ্তবাক্যে অনড় 'একই মিথ্যা চালিয়ে যাও এক সময়ে তা সত্য বলেই লোকে ধরবে।' রাহুল গান্ধীর ২০১৯-এ মোদীকে হারাবার প্রচার অভিযানের প্রধান অস্ত্র— অর্ধসত্য, জাল খবর, জালিয়াতি করে বানানো খবর।

গোয়েবলস ছেড়ে আরও পিছিয়ে গিয়ে তাঁরা আরও এক মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণে সক্রিয়। "Politics is power, power is politics-এর আক্ষরিক অর্থ নিয়ে কারুর কোনও দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকা মোটেই উচিত নয়। নির্বাচনে সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বীরা ক্ষমতার দখল নিতে নিষ্ঠুর খেলায় মেতে ওঠে। সেখানে কোনও নিয়ম খাটে না। কোনও দুর্বলতা দেখাবার জায়গা নেই। রাজনীতির সঙ্গে আদর্শ ও নৈতিকতার কোনও সম্পর্ক নেই। রাজনীতিতে পরিস্থিতি সাপেক্ষে যে কোনও অনৈতিক কাজই বৈধ।" হ্যাঁ, এগুলি মহামতি লেনিনের বাস্তববাদী উপদেশ। তাঁর এই শতাব্দী প্রাচীন বাণীর মর্যাদা রক্ষায় রাহুল গান্ধীরা বদ্ধপরিকর।

তাঁরা ফেসবুক ট্যুইটার-এ বেছে বেছে এমন তথ্যই ভাইরাল করে দিচ্ছেন যার দ্বারা মানুষের মধ্যে সুপ্ত থাকা কোনও গোপন ইচ্ছে বা লিপ্সাকে খুঁচিয়ে তোলা যায়। নিজস্ব মতামতগুলির সমর্থনে তাঁরা কিছু তাঁবেদার জুটিয়ে নিচ্ছেন। এই কাজ প্রাথমিক স্তরে ছোটো পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও খুব পরিকল্পিত ভাবে একে ক্রমশ বৃহত্তর ইন্টারনেট brotherhood-এর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তিগত লাভের ভিত্তিতে চলা সংস্থাগুলিই এই আন্তর্জালের অস্ত্রগুলির মালিক হওয়ায় তাদের কাছে নৈতিকতা বা খবরের সত্যতার কোনও মূল্য নেই। মূল্য আছে কেবল ভাইরাল করতে পারার সাফল্যের। ভাইরাল কথাটি কিন্তু এসেছে উৎসে ভাইরাস বা এক ধরনের জীবাণুর সংক্রমণের সূত্রে। সেটা ভুললে চলবে না। আর এই সংক্রমণ (ভাইরাল) কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে যে কোনও মুহূর্তে হিংসা উস্কে দিতে পারে। সমাজে অবিমিশ্র ঘৃণার বাতাবরণ তৈরি করার চরম পরিণতি— রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধও লাগিয়ে দিতে পারে। কারণ মাধ্যমটি তো আন্তর্জাতিক। ভ্রান্ত তথ্যে দুনিয়া ঢেকে দিতে পারলে এক সময়ে গণতন্ত্রও বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু এত কিছু সম্ভাব্য বিপদ ঘটাবার ক্ষমতাসম্পন্ন আপতকালীন পরিস্থিতি ঘনিয়ে আসার ক্ষেত্রে আমাদেরই কিন্তু চিহ্নিত করতে হবে এই মিথ্যা

যুদ্ধকে। একই সঙ্গে বুঝে নিতে হবে মিথ্যা যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য কী।

আজকের মিথ্যে তথ্যের যুদ্ধবাজরা সোশ্যাল মিডিয়াকে এক নিপুণ অস্ত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাস যে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধের ঘটনায় ভরা, আজকের মিডিয়া যুদ্ধ তারই রূপ বদল। লক্ষ্য একই, জয় হাসিল করা। তবে বাস্তবের যুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে মিথ্যার যুদ্ধের উত্থান কিন্তু বিশ্বে চকিতে এক মহা গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি করেছে।

মিথ্যের লড়াই সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করেছে আন্তর্জালের মাধ্যমে কত দ্রুত খবরকে দূরদূরান্তে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। একই সঙ্গে কত সহজে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিরা তার নাগালও পেয়ে যেতে পারে। আজকের দুনিয়ায় চোখের পলক ফেলতেই যার সঙ্গে আমার পরম শত্রুতা আছে তার সঙ্গেও মুখোমুখি যোগাযোগ সম্ভব আন্তর্জালে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে। অনায়াসে তর্ক জুড়ে দেওয়া আর এরই ফাঁকে ডিজিটাল দুনিয়ায় বিজ্ঞাপিত তার জীবনের হদিশও হাতে এসে যায়। সোশ্যাল নেটওয়ার্ক হাজার হাজার মাইল দূরের সম্ভাব্য শত্রুর ওপর আক্রমণের রাস্তা অবাধ করে দিয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সদা প্রাসঙ্গিক থাকতে, মানুষের নজর কাড়তে তাদের ভাবনায় ও অন্তরে প্রবেশাধিকার নিয়ে তাদের চিন্তায় প্রভাব খাটাবার কৌশল নিয়েছে রাহুল অ্যান্ড কোং। যেন তেন প্রকারেণ ব্যালটের যুদ্ধ জিততে পরিবারতন্ত্রের প্রতিভূ আজ মরিয়া।

প্রচার কৌশলে কংগ্রেসের অগৌরবের উত্তরাধিকার :

অতীতে গরিবী হটাও নিয়ে প্রচার মাধ্যমের অপপ্রয়োগ করে যে প্রতারণা হয়েছিল, রাহুল গান্ধী সেই উত্তরাধিকারই সদর্পে বহন করছেন। আন্তর্জালে প্রচারের মাধ্যমে ইতিমধ্যে যে সমর্থকের নেটওয়ার্ক তৈরি করেছেন সেখানে এখন চলছে শিবভক্ত, পৈতেধারীর নরম হিন্দুত্বের মাধ্যমে বোকা বানানোর নতুন অপকৌশল। এভাবে যদি হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ককে বুদ্ধু বানানো যায়!

সম্প্রচার মাধ্যমগুলির ক্রমবিকাশের পথে প্রথম ছিল টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা, তারপর রেডিও, এর পর আসে টেলিভিশন। এই প্রত্যেকটি মাধ্যমকেই যুদ্ধের সময় তথ্য সম্প্রচারের জন্য সৈনিকদের সম্মুখ সমরের সমান্তরাল ভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল বরাবর। প্রচার বিশ্বব্যাপী ফলপ্রসূ হয়েছিল এমনটা কিন্তু বলা যাবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রচারের ঢক্কা নিনাদ সত্ত্বেও নাজিরা পরাজিত হয়। ইংরেজরা এই বিপুল প্রচারকে শুধু বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দেয়। ৬০ ও ৭০-এর দশকে ভিয়েতনামে মার্কিন সৈন্য ৬.৫ টন বোমা ফেলার পাশাপাশি তাদের অসৎ উদ্দেশ্য ধামা চাপা দিতে ১ কোটি প্রচারপত্র বিলি করেছিল। অবশ্য উত্তর ভিয়েতনামবাসীরা এগুলিকে শৌচ কার্যেই শুধু ব্যবহার করেছিল। এর বিষয়বস্তুকে তারা ঘৃণা করত। বাস্তবে এই ভিয়েতনাম যুদ্ধকে মার্কিন দেশে টিভি যুদ্ধ আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। কেননা আমেরিকার যুদ্ধবাজদের ড্রইংরুমেই এর কৌশল ঠিক করা হতো।

এই সূত্রে মার্কিন সমর বিশারদ কল্যসউইজের তত্ত্বটি প্রাসঙ্গিক। তিনি যে কোনও ধরনের যুদ্ধকেই বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে বিচারের কথা বলছেন ''The moral elements are among the most important in war. They constitute the spirit that permeates (ঘিরে থাকে) the war as a whole... They establish a close affinity (সংযোগ) with the will that moves and leads the whole mass of force.'' মোদ্দা কথায় প্রতিটি যুদ্ধেরই একটা নৈতিক পটভূমি থাকে যা সৈনিককে প্রেরণা জোগায়।

আজকের মিথ্যে তথ্যের যুদ্ধবাজরা সোশ্যাল মিডিয়াকে এক নিপুণ অস্ত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাস যে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধের ঘটনায় ভরা, আজকের মিডিয়া যুদ্ধ তারই রূপ বদল। লক্ষ্য একই, জয় হাসিল করা।

কিন্তু রাহুল গান্ধী চাইছেন 'বোফর্সের' চেয়ে 'রাফেল'কে বড় কেলেঙ্কারি প্রমাণ করতে। এইচ এ এল বা হিন্দুস্থান এরোনটিক্স অর্ডার পেল না কেন? ইত্যাকার ফাটা ঢোল বাজাচ্ছেন। হঠাৎ যোগ হয়ে গেছে মন্দির যাত্রার সঙ্গে কপালে তিলক ও পৈতের খেলা যদি হিন্দু ভোট ফেরে। পরিবারতন্ত্রের প্রতিভূ আজ সন্ত্রস্ত কেননা তার যে জাতিকে পরিচালনার তিলমাত্র ক্ষমতা আছে এই বিশ্বাসই আজ বিপন্ন।

উপরিউক্ত পরিস্থিতি বিচার করে কয়েকটা কথা বলা জরুরি। এখন বিজেপি দল ও প্রধানমন্ত্রী মোদী যদি সোশ্যাল মিডিয়ায় পাল্টা প্রচার হিসেবে রাফেল সংক্রান্ত চুক্তির যতটা পারা যায় তার প্রক্রিয়া ও এই নিয়ে এইচ এ এল-এর অবস্থান স্বচ্ছভাবে তুলে দেন তাহলেই জোঁকের মুখে নুন পড়ে যাবে। মন্দির যাত্রা যে হিন্দুদের ধোঁকা দেওয়ার ভেক তা নিয়ে যদি সোশ্যাল মিডিয়ায় খুল্লাম খুল্লা আক্রমণ চালানো হয় দেশের ভোটদাতাদের মধ্যে এর কী বিধ্বংসী প্রতিক্রিয়া হবে তা সহজেই অনুমেয়।

আমি দৃঢ়ভাবে বলতে চাই ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে মিথ্য যুদ্ধেরও একটা সীমা আছে। একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ সম্প্রতি বলেছেন নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারিত হয় আরও বহু কৌশলের ভিত্তিতে। যার মধ্যে ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকে টাকা আর মস্তানের নির্ণায়ক ভূমিকা থাকে। তাই দিল্লির বা রাজ্য রাজধানীগুলির ঠাণ্ডা ঘরে বসে কখনওই নির্বাচনী ফলাফলের ভবিষ্যৎবাণী করা যায় না। তবে ঠাণ্ডা ঘর থেকে ক্রমিক মিথ্যের যুদ্ধ চালিয়ে গেলে দেশে ঘৃণা ও হিংসার চূড়ান্ত বিস্ফোরণ নিশ্চিত ঘটতে পারে, যা গণতন্ত্রের পক্ষে ধ্বংসাত্মক।

(লেখক সামরিক কৌশল নিরূপণ বিশেষজ্ঞ)

তিনসুকিয়ার ঘটনা অসমকে কাশ্মীর বানানোর ষড়যন্ত্রের অঙ্গ

সাধন কুমার পাল

নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল ২০১৬-র বিরুদ্ধে এবং ১৭ নভেম্বর (২০১৮) বাঙ্গালি হিন্দুদের ডাকা গণকনভেনশনের অনুমতি না দেওয়ার দাবিতে গত ২৩ অক্টোবর চুয়াল্লিশটি ইনডেজিনিয়াস পিপল অরগানাইজেশনের পক্ষ থেকে অসম বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছিল। কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির নেতা অখিল গগৈয়ের বক্তব্য, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার অসমীয়দের অস্তিত্ব বিপন্ন করতে নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল ২০১৬ পাশ করিয়ে হিন্দু বাঙ্গালিদের নাগরিকত্ব দিতে চাইছে। সেই জন্য কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির নেতৃত্বে প্রথমবার বনধ ডাকা হলো। এই বিলের সপক্ষে ১৭ নভেম্বর বাঙ্গালি হিন্দুদের ডাকা গণকনভেনশনের অনুমতি না দেওয়ার জন্যও সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়। এ ব্যাপারে ১ নভেম্বর পর্যন্ত চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। এই চূড়ান্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হতে না হতেই ১ নভেম্বর সন্ধ্যায় তিনসুকিয়ার ধোলা থানা এলাকার খেড়বাড়ি গ্রামে পাঁচ জন নির্দোষ বাংলাভাষী মানুষকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হলো। লাগাতার বাঙ্গালি বিরোধী বিষোদগার করে পরিবেশ বিষিয়ে তোলার অপরাধে আলোচনাপন্থী আত্মসমর্পণকারী দুই আলফা নেতা মৃণাল হাজারিকা ও জীতেন দত্তকে গ্রেপ্তার করার পর কিছু মানুষকে থানায় গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে পরিবেশকে আরও উত্তপ্ত করার অপপ্রয়াস করতে দেখা যায়। ২৩ অক্টোবরের বনধ এবং ১ নভেম্বরের গণহত্যা, ঘটনা দুটি একই ছকের অঙ্গ কিনা তা এখনি বলা না গেলেও, এদের লক্ষ্য যে একই তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

যে কোনও হত্যাকাণ্ডের নিন্দা হবে, প্রতিবাদ হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তিনসুকিয়ার জঘন্য গণহত্যার পর এরাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস যে ভাবে রাতারাতি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ফেস্টুন ব্যানার বানিয়ে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে রাস্তায় নামল এবং তাতে এটা স্পষ্ট ওরা যেন এরকম একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তো প্রথম প্রতিক্রিয়ায় বলেই দিলেন, বিজেপির লোক পুলিশের পোশাক পরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। অভিষেক প্রমাণ করলেন ঘটনা যত নির্মম নিকৃষ্ট হোক না কেন, মানুষকে বিভ্রান্ত করে সেটিকে রাজনীতির 'সোনালি ফসল' হিসেবে ঘরে তুলতে পারাই চরম লক্ষ্য। এই রকম 'সোনালি ফসল' যত ফলবে ততই দল তরতর করে এগিয়ে যাবে। অভিষেক একা নন বাঙ্গালির স্বঘোষিত রক্ষক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতামন্ত্রীরা অখিল গগৈয়ের মতো তীব্র বাঙ্গালি বিদ্বেষী নেতাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে হিন্দু বাঙ্গালিদের নাগরকিত্ব প্রদানে বদ্ধপরিকর অসম ও কেন্দ্র সরকারের মুণ্ডপাত করে গেলেন।

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস এন আর সি বিরোধী অবস্থান নেওয়ার পর অসমের মাটিতে দলের সাইন বোর্ডটুকুও টিকিয়ে রাখতে পারেনি। প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক ও অসম তৃণমুল কংগ্রেস সভাপতি দীপেন পাঠককেও পদত্যাগ করে নেত্রীর বিরুদ্ধে বিবৃতি দিতে হয়েছে। এই ঘটনায় এটাই প্রমাণিত হয় যে অসমে কোনও অজুহাতেই এমনকী বিজেপি বিরোধিতার নামেও এন আর সি-র বিরোধিতা করলে ওই রাজ্যে সাইনবোর্ডটুকুও টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর এক সময় কথায় কথায় বনধ, অবরোধ, সন্ত্রাসবাদী হামলায় বিপন্ন অসমে অপ্রতিকর ঘটনা ঘটেনি বললেই বলে। এমনকী এন আর সি-তে চল্লিশ লক্ষ মানুষের নাম বাদ যাওয়ার পরও অসমের শান্ত স্বাভাবিক পরিস্থিতি কংগ্রেস, অগপ, এ আই ইউ ডি এফ-এর মতো এক সময় দাপিয়ে বেড়ানো অসমের ভাগ্য নির্ধারক দলগুলিকে অস্তিত্বের সঙ্কটে ফেলে দিয়েছে।

এন আর সি থেকে বাদ পড়া বাংলাদেশ থেকে অত্যাচারিত হয়ে আসা বাঙ্গালি হিন্দুদের নাগরিকত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল ২০১৬ নিয়ে বিজেপির সক্রিয়তার আভাস পেয়েই মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া অসমের আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি সক্রিয় হয়ে উগ্র অসমীয় সেন্টিমেন্টকে জাগিয়ে তোলার সব রকম প্রয়াস শুরু করছে। পরিস্থিতির সুযোগ বুঝে উত্তরপূর্ব ভারতকে ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত চীন মদতপুষ্ট মাওবাদী, ইউরোপিয়ান মহাশক্তিগুলির মদতপুষ্ট চার্চ সংগঠন এবং ইসলামিক জেহাদিরা অসমের সেন্টিমেন্টের মোড়কে গড়ে ওঠা বিভিন্ন ইনডেজিনিয়াস সংগঠনের ছদ্মবেশে সক্রিয় হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। ক্ষমতার রাজনীতির অঙ্ক বলছে অসমকে যদি আবার আটের দশকের মতো প্রাদেশিকতার বিষ বাষ্পে জারিত আগ্নেয়গিরিতে পরিণত করা যায়, তাহলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বিজেপি আর নতুন করে ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করবে কংগ্রেস, অগপ, এ আই ইউ ডি এফের মতো বিরোধী দলগুলি। ২০১৫ সালের অসহিষ্ণুতার মোড়কে কৃত্রিম ঘৃণার পরিবেশ সৃষ্টি, আরবান নকশালের গ্রেপ্তারি, ভীমা-কোরেগাওয়ের দাঙ্গা, জে এন ইউ, যাদবপুর, হায়দরাবাদ, বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারত বিরোধী গ্যাংয়ের ঘটানো বিভিন্ন ঘটনা ও এই সমস্ত ঘটনায় কংগ্রেস দলের ভূমিকায় ইতিমধ্যেই এটা প্রমাণিত যে, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলির সৃষ্ট বিশৃঙ্খলাকে হাতিয়ার করে শতাব্দী প্রাচীন এই দলটি দিল্লির মসনদে ফিরতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। সুতরাং অসমে অখিল গগৈয়ের মতো আরবান নকশালদের সক্রিয়তার পেছনে বিরোধী আসনে উপবিষ্ট কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক দলগুলিরও মদত থাকাবে এটাই স্বাভাবিক।

লক্ষণীয় যে তিনসুকিয়ার ঘটনা ঘটিয়ে যখন বিচ্ছিন্নতাবাদীরা হিন্দু বাঙ্গালিদের নাগরিকত্বের বিষয়টি ভেস্তে দেওয়ার জন্য বিজেপির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে তখন মমতা ব্যানার্জিও পরিস্থিতিকে অগ্নিগর্ভ করে তোলার কোনও সুযোগই হাতছাড়া করতে চাইছেন না। মমতা ব্যানার্জি প্রকৃত বাঙ্গালি প্রেমী হলে অন্তত বাঙ্গালির স্বার্থ রক্ষার ইস্যুতে

কেন্দ্র ও অসম সরকারের পাশে দাঁড়ানো উচিত ছিল। কিন্তু তা না করে তিনি ও তাঁর দল এমন কিছু করছেন, যাতে হিন্দু বাঙ্গালিদের নাগরিকত্বের বিষয়টি আরও জটিল হয়ে উঠে।

১৯৪৭ সালে সিলেট অসম থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার পর ওই রাজ্যের মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ১৭.২ শতাংশ, ২০১১ সালের জনগণনায় যা ৩৪.৪ শতাংশে পৌঁছেছে। ১৯৪৭ সালে অসমের একটি জেলাও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল না। কিন্তু বর্তমানে অসমে ২৩টির মধ্যে ৯টি জেলায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। একদিকে মুসলমানদের বর্ধিত জন্মহার অন্যদিকে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ, এই দুটো যদি একসঙ্গে চলতে থাকে তাহলে জন-ভারসাম্য নষ্ট হয়ে এই রাজ্যটি যে, ভবিষ্যতে আরেকটি কাশ্মীরে পরিণত হবে এই বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। সেজন্য অনুপ্রবেশকারীদের বিচ্ছিন্ন করতে এন আর সি এবং জনসংখ্যার ভারসাম্য রক্ষা করতে হিন্দু বাঙ্গালিদের নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল ২০১৬-র আইনে পরিণত হওয়া একান্ত জরুরি।

'আপনাদের দিদিকে (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) বলবেন, ভিটে মাটি ছেড়ে কোনও হিন্দু এদিকে আসতে চায় না। বাংলাদেশের হিন্দু বিতাড়ন নিয়ে যেন তিনি সোচ্চার হন। তাহলে আর একজন হিন্দুকেও এদিকে আসতে হবে না। আর আমরা যারা এসেছি তাদের নিয়ে রাজনীতি করে যেন আবার বিপদের মুখে ঠেলে না দেন।'

অসমে নিজের দল কার্যত অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ার পরও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এন আর সি নিয়ে সরব হওয়ার কোনও সুযোগই হাতছাড়া করছেন না। নেত্রীর এই অবস্থান থেকে স্পষ্ট যে পশ্চিমবঙ্গে ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলতে থাকা বিজেপিকে মোকাবিলার উদ্দেশ্যে এন আর সি-কেই তিনি অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এই রণকৌশলের অঙ্গ হিসেবেই তিনি দু'বার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল অসমে পাঠিয়েছিলেন। সর্বভারতীয় চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে এন আর সি-র বিরোধিতার ইস্যুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যত একা। এন আর সি-র খসড়ায় বাদ পড়া সেই চল্লিশ লক্ষ মানুষ বিশেষ করে অসমের বাঙ্গালি সমাজ, বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দলের এই এন আর সি বিরোধী 'মানবিক অবস্থান', উদ্বেগ, আশঙ্কা ও প্রয়োজনে ছেড়ে কথা না বলার হুমকির ঘটনাবলি ঠিক কীভাবে নিচ্ছে এই বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া দরকার। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মানুষ শুনছেন ঠিকই, কিন্তু চোখ রেখেছেন অসমের দিকে। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে নেতা-নেত্রীরা যা বোঝাবেন মানুষ সেটাই বুঝবেন এটা আশা করা ঠিক নয়। সেজন্য মমতা বন্দ্যোপ্যায় এন আর সি নিয়ে যাই বলুন না কেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মতামতকে অনেক বেশি প্রভাবিত করবে প্রতিবেশী অসমের বাস্তব পরিস্থিতি।

এ ব্যাপারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যেই সংবাদমাধ্যমে এসেছে। অসম প্রদেশ কংগ্রেসের দলনেতা তথা প্রয়াত হিতেশ্বর শইকিয়ার পুত্র দেবব্রত শইকয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিন্দা করে বলেছেন, 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এখন বাঙ্গালি প্রীতি না দেখিয়ে অসমের বাঙ্গালিদের নাম যাতে বাদ না পড়ে তার জন্য নথি যাচাইয়ের বিশেষ বিভাগ তৈরি করে দিতে পারতেন তিনি। কিছুই না করে এখন তিনি অসমীয়া, বাঙ্গালি বিভাজনে মদত দিচ্ছেন।' সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করা তথ্য বলছে এন আর সি কর্তৃপক্ষ কর্মসূত্রে বা বিবাহ সূত্রে পশ্চিমবঙ্গের যে বাঙ্গালি অসমে বসবাস করেন তাঁদের নাগরিকত্ব সম্পর্কে আবেদন পত্রে দেওয়া তথ্য যাচাইয়ের জন্য ২০১৫ সালে ১ লক্ষ ২০ হাজার পশ্চিমবঙ্গবাসীর তথ্যপঞ্জি রাজ্য সরকারের কাছে পাঠায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাঠানো নথির মধ্যে মাত্র ১৫ হাজার নথি যাচাইয়ের পর ফেরত পাঠায়। পশ্চিমবঙ্গের তরফে এই তথ্য যাচাইয়ের তথ্য সামনে আসতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের বক্তব্য, 'মমতার অসম নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। যেসব বাঙ্গালি বিহারি, অসমীয়, নেপালি, হিন্দু-মুসলমানের নাম বাদ পড়েছে তাদের হয়ে অসমের মানুষ লড়াই করবে। বাইরের কারও তা নিয়ে রাজনীতি করার প্রয়োজন নেই।' অগপ নেতা অসম চুক্তির অন্যতম রূপকার প্রফুল্ল মহন্তের বক্তব্য, তৃণমূল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অসমের স্বার্থ বিঘ্নিত করছে। এখানে সংবাদ মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত যাদের বক্তব্য উল্লেখ করা হলো ওঁরা বিজেপির কেউ নয়, বরং চলমান রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ওঁদের সবারই অবস্থান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই বিজেপি বিরোধী শিবিরে।

অসমে এখন এমন একটি পরিস্থিতি যে কেউ সংবাদমাধ্যমে নিজের নাম প্রকাশ করে কোনও রকম বিতর্কে জড়াতে চাইছেন না। ফলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে মন খুলে অসমের সাধারণ বাঙ্গালিরা অনেক কথাই বলছেন। ওঁরা প্রশ্ন তুলছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি এতই বাঙ্গালি দরদি তাহলে বাঙ্গালি স্বার্থ রক্ষার জন্য বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে তিনি সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছেন না কেন? সুপ্রিম কোর্ট জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি ফর বেঙ্গলি রিফিউজি, পাবলিক ওয়ার্কস, অল অসম মাইনোরিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, জামাতে-উলেমা-ই-হিন্দের মতো আটটি সংগঠনকে তাদের মতামত জানাতে বলেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল কেন সুপ্রিম কোর্টে দরবার করা দলগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠলো না? শুধু সংবাদমাধ্যম ও মিছিল মিটিংয়ে অভিযোগ না করে অসমের মুখ্যমন্ত্রী কিংবা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে তিনি সমস্যার কথা তুলে ধরছেন না কেন? তাহলে কি বলতে হবে যে তৃণমূলনেত্রী যা করছেন সবটাই সস্তা ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি? তিনি কি অসমের কাল্পনিক বাঙ্গালি বিতাড়নের গল্প শুনিয়ে বাঙ্গালির একমাত্র ত্রাতা হয়ে নিজের রাজ্যে ভোট ব্যাঙ্ক গড়ে তুলতে চাইছেন?

অসমে যখন বাঙালি বিতাড়ন শুরু হয়েছিল তখন বিজেপি কিংবা সঙ্ঘ পরিবারের নাম গন্ধও ছিল না, কেন্দ্রে ও রাজ্যে সর্বত্রই মমতা ব্যানার্জির পুরোনো দল কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল। তখন তো কোনও কংগ্রেসিকে বাঙ্গালিদের দুঃখে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলতে দেখা যায়নি। এখন অসম অনেক শান্ত, জাতি বিদ্বেষ নেই বললেই চলে। এন আর সি-তে অনেক মানুষের নাম এখনো নথিভুক্ত হয়নি তবুও ওঁরা শান্ত। কারণ অসমের বর্তমান সরকার, কেন্দ্র সরকার ও অসমবাসীর উপর এই ভরসাটুকু আছে যে, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন ছয় বা সাতের দশকের মতো কাউকে অমানবিক অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে না। এই নিয়ে সস্তা রাজনীতি না করে প্রত্যেকের উচিত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। যে সমস্ত রাজ্যে নথি যাচাইয়ের জন্য পাঠানো হয়েছে তাদের উচিত যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সেই সমস্ত নথি যাচাই করে ফেরত পাঠানো। এই ব্যাপারে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। কারণ ভিন রাজ্যের বাসিন্দাদের মধ্যে অসমে পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি।

বাংলাদেশ থেকে আগত অসম নিবাসী হিন্দুরা প্রশ্ন তুলছেন, ‘আমাদের মতো অনেক বাঙ্গালি প্রায় প্রতিদিনই অত্যাচারিত হয়ে সর্বস্ব খুইয়ে মা-বোনের ইজ্জত হারিয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করছে। কোথায় তখন তো মমতা দিদির কোনও আওয়াজ শুনতে পাই না। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকার ও বামপন্থী সরকারগুলি মানবিকতা জলাঞ্জলি দিয়ে বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তু হিন্দুদের প্রতি যে নির্মম ব্যবহার করেছে সভ্য সমাজে তার দৃষ্টান্ত মেলা ভার। এক সময় পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকার বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের নামে জন্তু জানোয়ারের মতো ট্রাকে বোঝাই করে মধ্যপ্রদেশ বা ওড়িশার পশুখামারগুলিতে চালান করেছিল। এই সমস্ত উদ্বাস্তু শিবিরগুলির নারকীয় পরিবেশে কত উদ্বাস্তু বাঙ্গালি যে অনাহারে, অপুষ্টিতে, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে তার কোনও হিসেব নেই। উদ্বাস্তু ভোটে ক্ষমতায় এসে বামফ্রন্ট উদ্বাস্তুদের প্রতি এতটাই নির্মম হয়ে ওঠে যে ১৯৭৯ সালে মরিচঝাঁপিতে জ্যোতি বসুর পুলিশ রাতের অন্ধকারে সরাসরি গুলি চালিয়ে কত উদ্বাস্তু বাঙ্গালিকে যে মেরেছে তারও হিসেব নেই। যারা বেঁচে ছিল তাদের খাবার বন্ধ করে দিয়ে তিলতিল করে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছিল তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার। বাঙ্গালি বিরোধী এই সমস্ত পৈশাচিক আচরণ নিয়ে মমতা দিদি কোনওদিন সোচ্চার হয়েছেন?

সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখ রাখলে দেখা যাবে শুধু অসমের হিন্দুরা নয়, সোচ্চার হচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরাও। প্রশ্ন তুলছেন পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলার দাড়িভিটে উর্দুর বদলে বাংলা শিক্ষক নিয়ে আন্দোলন করাতে পুলিশের গুলিতে দুই তরুণ রাজেশ ও তাপসকে প্রাণ দিতে হলো কেন? কুচবিহার, দিনহাটায় প্রকাশ্য দিবালোকে খুন করা হলো দুই বাঙ্গালি ছাত্রকে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় যাদের মৃত্যু হলো তারাও বাঙ্গালি। অসমে পাঁচজন বাঙ্গালির মৃত্যু নিয়ে মিছিল মিটিং, অসমে প্রতিনিধিদল পাঠানো থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেস রাষ্ট্রপতির কাছে পর্যন্ত গেছে। নিজের রাজ্যে এতগুলি নির্মম হত্যা নিয়ে ওরা নীরব কেন? মানবিক পদক্ষেপ হিসেবে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে আগত সমস্ত অসহায় বাঙ্গালি উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব প্রদান করে ভারতে ওদের শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাসের জন্য ‘নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৬’ আনার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে। এর আগে একটি গেজেট নোটিফিকেশন করে বলে দেওয়া হয়েছে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে যে সমস্ত উদ্বাস্তু (পড়ুন হিন্দু শিখ বৌদ্ধ খ্রিস্টান) বাংলাদেশ থেকে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে কোনও প্রমাণ পত্র না থাকলেও তাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো যাবে না। এর থেকেই প্রমাণ হয় বাঙ্গালিদের জন্য যদি কেউ কিছু করে থাকে সেটা একমাত্র বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিলের বিরোধিতা করে অসহায় বাঙ্গালিদের সর্বনাশ করতে চাইছেন কেন?

যাদের জন্য নিজেদের চোদ্দ পুরুষের ভিটে ছাড়লাম সেই বাংলাদেশি মুসলমানরাও বেশ ভালো সংখ্যায় ভারতে এসে ঢুকে বসবাস করছে। বিজেপি এদের অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করে বিতাড়নের কথা বললেও মমতা দিদি তাদের নাগরিকত্বের দাবি করেছেন কেন? তাহলে কি তিনি ভারতেও বাংলাদেশের মতো পরিস্থিতি তৈরি করতে চান? এসব কথা বললে এখানে সাম্প্রদায়িক হয়ে যায়। কিন্তু এন আর সি বা কোনও হিন্দু মুসলমানের ব্যাপারে নয়। কারণ বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু মুসলমানরা এদেশে প্রবেশ করে ভারতের সংখ্যালঘুদের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধেয় ভাগ বসাচ্ছে। ‘নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৬’ নিয়েও হিন্দু মুসলমান করা উচিত নয়। কারণ দেশভাগ হিন্দু বাঙ্গালিদের উপর যে অভিশাপ ডেকে এনেছিল এই বিল তার উপর একটা মানবিক প্রলেপ মাত্র। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেদক পরিচয় পেয়ে বাংলাদেশ থেকে আগত অনেক হিন্দু বাঙ্গালির কাতর নিবেদন, ‘আপনাদের দিদিকে (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) বলবেন, ভিটে মাটি ছেড়ে কোনও হিন্দু এদিকে আসতে চায় না। বাংলাদেশের হিন্দু বিতাড়ন নিয়ে যেন তিনি সোচ্চার হন। তাহলে আর একজন হিন্দুকেও এদিকে আসতে হবে না। আর আমরা যারা এসেছি তাদের নিয়ে রাজনীতি করে যেন আবার বিপদের মুখে ঠেলে না দেন।’

অসমের বাঙ্গালিদের ভাবনার খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেল শিলচর ভিত্তিক কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাঙ্গালি (পড়ুন বুদ্ধিজীবী) গোপনে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে এন আর সি বিরোধী শক্তিগুলিকে সহায়তা করছে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গেও এন আর সি নিয়ে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু সবার মধ্যে আতঙ্ক তৈরির প্রয়াস হচ্ছে। এন আর সি-র খসড়া তালিকার প্রকাশ হয়েছে গত ৩০ জুলাই। এই তালিকা প্রকাশের ঠিক ১২ দিন বাদে গত ১১ আগষ্ট কলকাতার মেয়ো রোডের অমিত শাহের সভায় বিপুল জনসমাগম বলে দিচ্ছে বিজেপিও বসে নেই এবং মমতা ব্যানার্জি এন আর সি ইস্যুটিকে যেভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বিষয়টিকে সেই ভাবে দেখাতে ইচ্ছুক নন। বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তু হিন্দুদের একমাত্র রক্ষাকবচ ‘নাগররিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৬’ এবং এই বিল পাশ করাতে বিজেপি বদ্ধপরিকর— এই প্রচার তুঙ্গে নিয়ে যাওয়াই বিজেপির লক্ষ্য। সেই সঙ্গে বিজেপি এটাও বোঝাতে বদ্ধপরিকর যে, ইসলামিক বাংলাদেশ থেকে মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা আসলে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য বরাদ্দে ভাগ বসিয়ে ওদের নায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করছে। বিজেপি শুধু কাল্পনিক তত্ত্ব কথা নয়, উদাহরণ হিসেবে অসমকে তুলে ধরবে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এন আর সি নিয়ে এটা হতে পারে, ওটা হবে গোছের কিছু ভবিষ্যৎ বাণী ছাড়া তেমন কিছু বলার নেই? সেজন্য প্রশ্ন হচ্ছে রণক্ষেত্রে এই ধরনের কাল্পনিক অস্ত্র বুমেরাং হবে না তো? ■

বিশেষ প্রতিবেদন

আত্মপ্রচারের ঢক্কানিনাদ আর সুযোগসন্ধানী রাজনীতিই মমতার সম্বল

সনাতন রায়

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বিরোধী নেত্রী ছিলেন, তখন সাংবাদিকদের সঙ্গে মুড়ি আর আলুরচপ খেতে খেতে আড্ডা দেওয়ার সময় প্রায়শই টেনে আনতেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার প্রসঙ্গ। প্রসঙ্গটি ছিল জয়ললিতার প্রচার কৌশল। কীভাবে গোটা মেরিনা বিচ সেজে উঠত জয়ললিতার পোস্টার, আলোকসজ্জিত হোর্ডিং আর বিলবোর্ডে। কীভাবে গোটা শহর জুড়ে ঝুলত তাঁর কাটআউট। আর শোনাতেন তাঁর জনপ্রিয়তার কথা।

আজ যখন পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা উপেক্ষা করেও মুখ্যমন্ত্রীর সহাস্য বদনের হোর্ডিং, পোস্টার প্রতি দু' হাত অন্তর চোখে পড়ে, তখন মনে হয়, জয়ললিতা ছিলেন তাঁর রোল মডেল। প্রচার এবং অতি প্রচারের ঢক্কানিনাদ কীভাবে গোয়েবলসিয় প্রোপাগান্ডাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে, তার এক অনন্য নজির গড়েছেন ভারতবর্ষের অন্যতম ক্ষুদ্র রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। জয়ললিতার কাণ্ডকারখানা যে সেই সময় থেকেই তিনি নিজের মনের ভিতর সযত্নে পালন করছিলেন, তা আজ পরিস্ফুট।

এই মুহূর্তে রাজ্যে রাস্তার ধারে এবং মোড়ে ঠিক কত হোর্ডিং লাগানো রয়েছে? কেউই সঠিকভাবে বলতে পারবেন না। কারণ হোর্ডিং আর ব্যানারে পুরকর উঠে যাওয়ার পর 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে' হয়ে উঠে যে যেভাবে পারছেন সরকারি জায়গার অপব্যবহার করে দৃশ্যদূষণ ঘটাচ্ছেন। তবে লক্ষণীয় যা, তা হলো— হোর্ডিং, ব্যানার আর কাটআউটের বেশিটাই দখল করে আছে রাজনৈতিক দলগুলি। নববর্ষ পালিত হয়েছে সেই বৈশাখ মাসে। আর এক বৈশাখ আসতে চলল। এখনও দেখবেন রাজনৈতিক নেতাদের ছবি সহ ব্যানার— 'নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই।' সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় এই সব রাজনৈতিক হোর্ডিং বা ব্যানারের সিংহভাগ (অন্তত ৯০ শতাংশ) দখল করে রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কোথাও বাণী— তিনি সততার প্রতীক। কোথাও তিনি উন্নয়নের কাণ্ডারি আর সবচেয়ে বেশি হোর্ডিং অনুপ্রাণিত তাঁর অনুপ্রেরণায়। তা সে মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালই হোক কিংবা ছোটোখাটো শৌচাগার।

রাজ্যের মানুষের মনে আছে, ক্ষমতায় আসার কয়েক মাস পরেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কলকাতা শহরকে দৃশ্যদূষণ থেকে রক্ষা করতে বেআইনি হোর্ডিং সব খুলে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। খোলাও হয়েছিল। মানুষ খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু আসল ছকটা বোঝা গেল কিছুদিন পরেই। দেখা গেল, হোর্ডিং, ব্যানার থেকে পুরকর তুলে নেওয়া হলো। আর গোটা কলকাতা এবং মফস্সল শহরগুলো ভরে গেল 'সততার প্রতীক'-এর হাস্যরসসিক্ত মুখব্যাদানে। তার নামে বিনা ট্যাক্সে প্রচারের ঢক্কানিনাদের সূত্রপাত হলো। এহ বাহ্য। দেখা গেল বাণিজ্যিক হোর্ডিংয়ের ওপরই ঝুলছেন মুখ্যমন্ত্রী। অন্য রাজনৈতিক দলের হোর্ডিং-ব্যানারে ঢেকেও তিনিই হাসছেন। নির্লজ্জ বাস্তবতা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Institute for Propaganda Analysis প্রচারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছে, "Propaganda is expression of opinion of action by individuals or groups or actions of other individuals or groups to predetermined ends." অর্থাৎ প্রচারের চরিত্র লক্ষণ হলো কোনও মতবাদের পক্ষে ঢক্কানিনাদ তুলে সেই মতবাদ যেন তেন প্রকারেণ মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া এবং তাকে দিয়ে কিছু করিয়ে নেওয়া। সমাজতাত্ত্বিকরা বলেন, প্রচার এবং অতি প্রচার মূলত সাতটি পদ্ধতিতে করা হয়—

১। বদনাম দেওয়া অর্থাৎ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে বিরূপ ধারণা গড়ে তোলার জন্য মিথ্যা বদনাম দেওয়া।

২। মহত্ত্ব আরোপ অর্থাৎ নিজের পক্ষে ঝোল টেনে নিজের পক্ষে যত ভালো ভালো কথা, তা জলজ্যান্ত মিথ্যা হলেও প্রচার করা।

৩। গৌরব আরোপ অর্থাৎ আত্মপ্রচারের জন্য নিজেকে বিখ্যাত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তুলনা করা।

৪। সাক্ষ্যপ্রমাণ আরোপ বা মনীষীদের

বক্তব্য তুলে ধরে আত্মপ্রচার করা।

৫। জনগণের নামে আরোপ অর্থাৎ জনগণের মঙ্গলের নাম করে মিথ্যা প্রচার করা।

৬। ব্যান্ড ওয়াগান প্রক্রিয়া বা অন্তর্নিহিত লোকভয়কে চাপিয়ে দিয়ে মানুষকে প্রচারের পথে নামানো।

৭। মতবাদ প্রচার ও প্ররোচনা অর্থাৎ নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জনমতকে জোর করে নিজ পক্ষে টেনে আনা।

এবার মুখ্যমন্ত্রীর কার্যকলাপগুলি বিশেষজ্ঞদের থিওরিগুলির সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

১। মিথ্যা বদনামে অন্যকে ভাগীদার করায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। খুন হলেই আগে বিরোধী দলের নেতাদের নামে দোষ চাপিয়ে তারপর নির্দেশ দেন তদন্তের।

২। নিজেকে প্রচার করেন 'সততার প্রতীক' আর 'উন্নয়নের কাণ্ডারি' বলে। এ ব্যাপারেও তাঁর জুড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

৩। তিনি নিজেকে ডক্টরেট বলে প্রচার করেন। এমনকী তিনি বাংলার রূপকার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের চেয়েও অনেক বেশি উন্নতি করেছেন বলে তাঁর দল প্রচার করে।

৪। তিনি কথায় কথায় স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, নজরুল আওড়ান। ভুলভাল তথ্যও দেন। বোঝাতে চান, তিনি কত পণ্ডিত।

৫। মা-মাটি-মানুষের স্লোগান তাঁর অন্যতম অস্ত্র। এই স্লোগান সর্বস্ব রাজনীতিই তাঁর প্রধান অবলম্বন।

৬। গোটা সমাজের ওপর তৃণমূলি আক্রমণের ভয় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কখনও কার্টুন শিল্পীকে গ্রেপ্তার করে, কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী কিংবা কামদুনি গ্রামের দু'জন মহিলাকে মাওবাদী আখ্যা দিয়ে, কখনও সোশ্যাল মিডিয়ায় বিরোধীদের বিরুদ্ধে সাইবার ক্রাইমের মামলা দেবার ভয় দেখিয়ে।

৭। উন্নয়নের প্রচার মানুষ মনেপ্রাণে স্বীকার না করলেও স্লোগানে গলা মেলাতে বাধ্য করানো।

হিটলার তাঁর প্রচারসচিব গোয়েবলসকে দিয়ে এমনভাবে প্রচার কার্য চালাতেন যে তার বিরোধিতা করার সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হতো। তাঁর মতামত ও কার্যকলাপের কোনও প্রতিবাদ করা, কাটছাঁট করা বা সংশোধন করার কোনও রাস্তা রাখা হতো না। মিথ্যা প্রচারকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করা হতো। বুদ্ধির গোড়ায় নয়, সুড়সুড়ি দেওয়া হতো সেন্টিমেন্টের গোড়ায়। এর জন্য প্রয়োজনে যাবতীয় মিথ্যার আশ্রয় নিতেও দ্বিধা করতেন না হিটলার।

পশ্চিমবঙ্গের নেত্রী হাঁটছেন একই পথে। ক্ষমতায় পা রাখার পরদিন থেকেই। বিদেশিদের চিহ্নিতকরণ প্রকল্পকে তিনি প্রচার করছেন বাঙ্গালি খেদাও প্রক্রিয়া বলে। কেন্দ্রীয় প্রকল্প স্বচ্ছ ভারত অভিযানকে চালাচ্ছেন নির্মল বাংলা অভিযান বলে। ৮০ লক্ষ বেকারকে চাকরি দিয়েছেন বলে প্রচার করছেন। বিরোধীদের দাবি মতো তালিকা প্রকাশ করছেন না। অসমীয় বাঙ্গালি খুনের জন্য বিজেপিকে দায়ী করছেন। অথচ একবারও স্বীকার করছেন না খুনের জন্য ধৃত উলফা জঙ্গি জিতেন দত্ত আসলে একজন সক্রিয় মাওবাদী কর্মী। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ যে আছে, তাও অচিরেই প্রমাণ হবে, কিন্তু স্বীকার করা হবে না এ রাজ্যে। এ রাজ্যের বিপণন এখন সম্পূর্ণ ভাবে করায়ত্ত ফড়েদের। কিন্তু দোষ চাপানো হচ্ছে কেন্দ্রের ওপর। পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে বিশ্বস্তরে। স্থানীয় কারেন্সির দাম কমছে গোটা বিশ্বেই। অথচ এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এমনভাবে প্রচার করছেন যেন কেন্দ্র দাম বাড়াচ্ছে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই। টাকার দাম কমছে শুধু ভারতেই।

স্বেচ্ছাচারী প্রশাসকরা সব সময়েই মুখে একটা ভালমানুষের মুখোশ পরে থাকেন। এ রাজ্যেও সেটাই হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মানবদরদি সাজছেন। কিন্তু আসলে তিনি হতে চাইছেন Benevolent Dictator ---মানবদরদি স্বৈরাচারিণী। তাই শুধু রাজ্যের গরিব মানুষকেই নয়, যুব সমাজ, বুদ্ধিজীবীদের একাংশ এবং অবশ্যই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ভিখারি বানিয়ে তাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন ভিক্ষাপাত্র যাতে এরা কোনওদিনই আর কোমর সোজা করে দাঁড়াতে না পারে, মুখ খুলতে না পারে।

কিন্তু ওই কথায় বলে, অতি চালাকের গলায় দড়ি। চালাকি করতে করতে এবার নিজের ফাঁদে নিজেই পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। নীচের বিজ্ঞাপনটি লক্ষ্য করুন। এটি প্রকাশিত হয়েছে বর্তমান সংবাদপত্রে গত ৪ নভেম্বর। বাজারের প্রকৃত চিত্রটা কী?

সরষের তেল— প্রতি লিটার ৯৫ থেকে ১০৫ টাকা।

রাইস ব্রান তেল— প্রতি লিটার ৯৭ থেকে ৯৮ টাকা। অনলাইনে একত্রে তিন লিটার নিলে ৯৫ টাকা প্রতি লিটার।

ময়দা— প্রতি কেজি ৪০ থেকে ৪৪ টাকা।

চিনি— প্রতি কেজি ৪৬ থেকে ৪৮ টাকা।

তাহলে ভরতুকিটা কোথায়?

আব্রাহাম লিঙ্কন বলেছিলেন, 'তুমি সব মানুষকে কিছু সময়ের জন্য বোকা বানাতে পারো, কিছু মানুষকে সব সময়ের জন্য বোকা বানাতে পারো কিন্তু সব মানুষকে সব সময়ের জন্য বোকা বানাতে পারবে না।

বহু প্রচলিত এবং বহু মানুষের মনে আজন্ম লালিত এই খাঁটি বাস্তবটি এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জানেন না, একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তিনি যা করছেন জেনে শুনেই করছেন। কারণ তাঁর রাজনীতিটাই হলো পার্টটাইম পারসুয়েশন। আংশিক সময়ের রাজনীতি। বাকিটা হলো সুযোগের সন্ধান। ক্ষমতা এবং অর্থের।

মা-মাটি-মানুষের দরদি সেজে তিনি যাত্রা করতে পারেন। অভিনয় ভালো হলে মানুষ হাততালি তো দেবেই। কিন্তু ওই হাত একদিন 'দড়ি ধরে মারো টান' বলে সমবেতও হবে।

সেদিন বেশি দূর নয়। ■

জিহাদের হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করতে হবে

আর. এন. দাস

জিহাদের কথা শুনলেই সকলেরই অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। বিশেষ করে সেই হিন্দু বাঙ্গালিদের, যারা ১৯৪৬ সালের কলকাতা ও নোয়াখালির ভীষণ নরসংহারের কথা পড়েছেন বা শুনেছেন। মনে রাখতে হবে, প্রশাসনের মদত না থাকলে জিহাদিরা একাকী বা দলবদ্ধ ভাবে কখনই অন্য সমাজের লোকদের শেষ করে দিতে পারে না। গত ৭০ বছর ধরে ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসছে জিহাদিদের তাণ্ডব। শুধু ভারতকেই নয়, আজ সারা বিশ্বকেই এই আগ্রাসী বিশ্বগ্রাসী জিহাদি হিংসার বলি হতে হচ্ছে। হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী সনাতন ধর্মের দেশ ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে কট্টর ইসলামিক দেশের জন্ম দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র মুসলমান তুষ্টিকরণের নীতি অবলম্বন করে। আর তার জন্য দেড় কোটি হিন্দু-শিখ নরনারী উদ্বাস্তু হয়েছেন আর ৩০ লক্ষেরও অধিক হিংসার যূপকাষ্ঠে বলি হয়েছেন। কাশ্মীরী হিন্দুদের দুরবস্থা তো নিজের চোখে দেখতেই পাচ্ছেন। ঋষি কশ্যপের তপভূমির নাম কাশ্মীর, আচার্য শংকরের উত্তরাঞ্চলীয় মঠের নাম কাশ্মীর, কলহনের রাজতরঙ্গিণীর কাশ্মীর আজ কিন্তু জিহাদিদের করাল কবলে ভুলুণ্ঠিত। আজ শুধু কংগ্রেস নয়, তার দোসর বামপন্থী, সেকুলারবাদী, সমাজবাদী, ধর্মনিরপেক্ষবাদী এবং অসংখ্য নীতিহীন লোভী ভ্রষ্টাচারীর দল যারা শুধু মাত্র কিছু টাকা, অস্থায়ী পদ বা প্রতিষ্ঠার বিনিময়ে নিজের মা-বোন, দেশ, বাপ-ঠাকুর্দার ধর্ম-সংস্কৃতি ও ভাষাকেও বিসর্জন দিতে পিছপা হচ্ছে না। মোদীর বিরুদ্ধে তারা ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের রণাঙ্গণে একজোট হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা সবাই কিন্তু হিন্দুনামধারী মুসলমানপ্রেমী দেশদ্রোহী যারা মাত্র ২৬ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটের উপর নির্ভর করে, দিল্লির সত্তা দখল করে, ভারতকে এক ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সবাই চাইছে, নিজে প্রধানমন্ত্রী হতে। দেশের বা দেশবাসীর স্বার্থের জন্য তারা এগিয়ে আসছে না। শুধমাত্র নিজের আর পরিবারের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য তারা ভারতের মতো বিশাল দেশকে আবার বহু খণ্ডে বিভক্ত করতে চাইছে। কর্মসূত্রে বহুদিন বিদেশে থাকার জন্য আমেরিকা বা ব্রিটেনের প্রশাসনের দুর্বলতাগুলি খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করেছি। আজ এই প্রতিবেদনে তারই কিছু অংশ সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। ইদানীং শুরু হয়েছে, 'রাফেল' নাম ফ্রান্সের বোমারু বিমান নিয়ে বাকবিতণ্ডা। মোদী বনাম চীনপন্থী-পাকিস্তানপন্থী রাহুল গান্ধীর দ্বৈত সমর। মোদী চান দেশের সুরক্ষা মজবুত করতে। কট্টর ইসলামিক দেশ পাকিস্তান আর কমিউনিস্ট চীনের আগ্রাসন থেকে দেশকে সুরক্ষা প্রদান করতে। তার জন্য দেশের বিমানবাহিনীকে শক্তিশালী করা ভীষণ জরুরি। আর দেশদ্রোহীরা ঠিক তার উল্টোটা করছে। তথাকথিত সংবিধানের রক্ষাকবচের আড়ালে, বাক্‌স্বাধীনতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে। সর্বশক্তি দিয়ে মোদী 'মেক ইন ইন্ডিয়ার' পণ করেছেন আর সমস্ত বিপক্ষীয় দল একজোট হয়ে 'ব্রেকিং ইন্ডিয়া'র প্ল্যান করছে। আমরা অসহায় হয়ে শুধু দেখছি আর শুনছি। যদিও লেখক কোনও সামরিক বা জিহাদ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নন কিন্তু সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে এবং জিহাদের বিরুদ্ধে কীভাবে সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে সচেতন করে তার প্রতিরোধ করা যায়, তারই একটি ক্ষুদ্র প্রয়াসের চেষ্টা করছি মাত্র।

> **ইসলামিক জিহাদ এবং মাওবাদী ষড়যন্ত্র, দেশের সবথেকে বড় বিপদ। তাকে নির্মূল করতে হবে। অর্থাৎ এই দুই ভয়ংকর, আগ্রাসী ও হিংসাত্মক মতবাদের উৎসকেই চিরতরে সমাপ্ত করতে হবে।**

শত্রুকে শনাক্ত করা ও তার শক্তির সঠিক পরিমাণ নিরূপণ করা

পঞ্চম শতাব্দীর বিখ্যাত চৈনিক মনীষী ও লেখক 'আর্ট অব ওয়ারের' রচয়িতা এবং সামরিক বিশেষজ্ঞ সান জু-এর কথা অনুযায়ী শত্রুজয়ের এটাই সর্ব প্রথম কাজ। আমাদের দেশে প্রকাশ্যে এবং গোপন আস্তানায় আছে অনেক ইসলামিক সংগঠন। সিমি, পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া, জামাত-ই-উলেমা-ই হিন্দ, ইসলামিক গার্লস স্টুডেন্টস অরগানাইজেশন, জামাত-আল- হাদিত, সলিডারিটি ইউথ মুভমেন্ট এবং স্টুডেন্টস ইসলামিক অরগানাইজেশনের শাখা ভারতের প্রতিটি প্রদেশে নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে। এদের সমর্থন করছেন প্রাক্তন আই পি এস অফিসার, উকিল, হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের জজ, বলিউডের তিন খান, স্ক্রিপ্ট রাইটার, শিক্ষাবিদ থেকে শুরু করে অসংখ্য সাংসদ এবং প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারির মতো কট্টর মুসলমানরা। এদের সকলের উদ্দেশ্য একটাই। আর সেটা হচ্ছে যেনতেন প্রকারেণ ভারতকে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করা। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেন সারা বিশ্বই একদিন দারুল-ইসলামে পরিণত হয়ে যাবে।

কংগ্রেস সরকার কেন্দ্রে এবং বহু প্রাদেশিক সরকার প্রশাসনের সাহায্যে, ভোটব্যাঙ্কের লালসায়, বাংলাদেশি, পাকিস্তানি, রোহিঙ্গা এবং আফগানিস্থানের অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার, আধার ও রেশন কার্ড বা সচিত্র পাশপোর্ট ইত্যাদির সাহায্যে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করে

ভারত তথা বিভিন্ন প্রদেশের জনবিন্যাসেরই আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে। এদের কারা ফান্ডিং করছে, দেশের মধ্যে এবং বিদেশ থেকে হাওয়ালার মাধ্যমে দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে কারা পঙ্গু করে দিচ্ছে, কীভাবে এই জিহাদিরা মাওবাদীদের সাহায্য নিয়ে কাশ্মীর, কেরল, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চালাচ্ছে, বিদেশি শক্তি অর্থাৎ পাকিস্তান ও চীনের মদতে দেশীয় গৃহশত্রুরা কীভাবে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে চলেছে, তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং ধৃত ব্যক্তিদের দেশদ্রোহিতার শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ড বহাল করতে হবে। বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের তৈরি আইন সংক্রান্ত নিয়মগুলি যেমন মোকা এবং পোটা ইত্যাদির পুনর্বহাল করতে হবে। ইসলামিক জিহাদ এবং মাওবাদী ষড়যন্ত্র, দেশের সবথেকে বড় বিপদ। তাকে নির্মূল করতে হবে। অর্থাৎ এই দুই ভয়ংকর, আগ্রাসী ও হিংসাত্মক মতবাদের উৎসকেই চিরতরে সমাপ্ত করতে হবে। ভরত তথা সমগ্র বিশ্বেই আজ এই দুই মতবাদের জন্য অসংখ্য নিরীহ মানুষকে অকালে মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে।

জিহাদিদের সমস্ত পরিকল্পনা ও তাদের সংগঠনগুলিকে নির্মমভাবে গুড়িয়ে ফেলা

এন আই এ, আই বি, সি বি আই, ই ডি এবং আর এ ডব্লুর মতো সুরক্ষা সংস্থাগুলিকে আরও স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে, যাতে তারা নির্বিঘ্নে তাদের কাজ দেশের হিতের জন্য করতে পারেন। অজিত দোভালের মতো আরও দেশপ্রেমিক ও দক্ষ সুরক্ষা উপদেষ্টার প্রয়োজন আছে। 'পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়ার' মতো অনেক রাষ্ট্রদ্রোহী সংগঠন নিরন্তর ভারতকে 'গাজওয়া-ই-হিন্দ' করার ষড়যন্ত্র করে চলেছে, তাদের উচ্ছেদ করতে হবে। সম্প্রতি কেরলের কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক সরকারও এদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। এই মুখোশধারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি গোপনে প্রাদেশিক সরকারের এবং গৃহশত্রুদের সাহায্য নিয়ে অত্যন্ত গুপ্ত প্রক্রিয়ায় উইপোকার মতো ভারতকে ভিতর থেকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। অবিলম্বে এদের নির্মূল করার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়েছে, এখন এই তথাকথিত হিংসাত্মক দেশদ্রোহীদের বিনাশের মধ্যেই দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করা সম্ভব হবে।

ইসলামিক সংগঠন যেন সরকারের কাজের অংশীদার না হয়

ভারতের সাংবিধানিক রক্ষাকবচে এই দেশদ্রোহীরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল আছে। তাদের অবিলম্বে অপসরণ করতে হবে। দেখা গেছে আমলারা নানাভাবে জিহাদিদের হয়ে পক্ষপাতপূর্ণ ব্যবহার করেছে। সুপ্রিম কোর্টের জজ থেকে আরম্ভ করে, আই এ এস এবং আই পি এস— সমস্ত শ্রেণীর আমলারাই পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। তাই অবিলম্বে, সংবিধানের পরিবর্তন করে দেশকে ইসলামিকরণের হাত থেকে বাঁচাতেই হবে। ব্রিটেনের ১৬টি শহরের মেয়র হচ্ছেন মুসলমান। এ ব্যাপারে লন্ডনের মেয়র সাদিক খানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক নাগাড়ে ১০ বছর উচ্চপদে আসীন থেকেও, ভারতের প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারির অভিযোগ, 'এখন ভারতে মুসলমানরা অসুরক্ষিত'। সুপ্রিমকোর্টের জজ আলতমাস কবিরের মতো অনেক পক্ষপাত দুষ্ট বিচারপতির জন্য আজ ভারতে হিন্দুদের পক্ষে সুবিচার পাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জিহাদের বিরুদ্ধে গড়ে তুলতে হবে এক সঙ্ঘবদ্ধ ও ব্যাপক কৌশল

প্রতিটি দেশের সঙ্গেই ভারতকে ইসলামিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একমঞ্চে দাঁড়িয়ে অবিচ্ছিন্ন যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে যেমন করছে ইজরায়েল নিজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে। আজ ভারতের প্রতিটি প্রদেশের শহরে ও গ্রামে এক একটা মিনি পাকিস্তান গড়ে উঠেছে কংগ্রেসের কুশাসনে। তার পরিণাম হয়েছে অত্যন্ত মর্মান্তিক। ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাই জাপানের রাষ্ট্রপ্রধান সিনজো আবে, রাশিয়ার পুতিন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং ইজরায়েলের প্রাক্তন মোসাদ-প্রতিনিধি বেঞ্জামিন নেতানহুর যথেষ্ট আস্থাভাজন ও বন্ধুত্ব লাভ করতে পেরেছেন। মধ্য-এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে থেকেও এই বিষয়ে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া গেছে। তাই মুসলমান দেশ, ইউ এ ই-তে মোদীর প্রচেষ্টায় হিন্দুরা মন্দির করার অনুমতি পেয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বের প্রতিটি দেশের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকেই ইসলামিক এই দানবীয় ও মধ্যযুগীয় বর্বরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে।

জিহাদিদের বিরুদ্ধে গড়ে তুলতে হবে এক ব্যাপক এবং নিরন্তর প্রচার অভিযান

কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের উচিত উপযুক্ত ও সক্ষম প্রচার মাধ্যম সৃষ্টি করা, যাতে করে প্রতি মুহূর্তে ইসলামের কুনীতিগুলির বিরুদ্ধে মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নিয়মিত ডিবেট করে, সিনেমা ও নাটক মঞ্চস্থ করে, গল্প ও কথাকাহিনির মাধ্যমে জনমানসে জিহাদের আসল রূপটা তুলে ধরতে হবে। আমরা ভুল করে বলি, 'সত্যমেব জয়তে' আর বলিউডের আমির খান চালাকি করে সেই গোয়েবলিয় পদ্ধতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর দেশে সুচতুর ভাবে হিন্দু-বিরোধী ইসলামিক প্রচার ও প্রসার চালান। আমরা নিশ্চুপ হয়ে দেখি মাত্র।

'শরিয়া আইন'কে কোনও কারণেই সংবিধানে বা দেশীয় আইনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা চলবে না

নতুন আইন প্রণয়ন করে ইসলামিক রীতিনীতি যাতে অ-মুসলমানদের উপর জোর করে চাপিয়ে না দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এটা ইসলামের 'গোপন জিহাদ' এবং অনতিবিলম্বে এটাকে রাষ্ট্রদ্রোহের আইনের মধ্যে আনতে হবে। ফ্রান্সের সরকারি আইনজ্ঞরা বলেছেন, কোরানের মধ্যে যে আয়াতগুলিতে বিধর্মীদের কোতল করার নির্দেশ আছে সেগুলিকে বাতিল করতে হবে। আমাদের দেশেও জনমানসে এর প্রতিক্রিয়ার সমীক্ষা চালাতে হবে। প্রেসিডেন্ট সি জিন পিঙ্গের নেতৃত্বে চীনের সরকার উইগুর প্রদেশে, দশ লক্ষ কট্টর মুসলমানদের 'ছাগল দাড়ি' এবং 'ফেজটুপি' পরা নিষিদ্ধ করতে পেরেছে। আমাদের দেশে ইউনিফর্ম সিভিল কোডের মধ্যে সবাইকে আনতে হবে। রাশিয়ান পার্লামেন্ট বা ডুমাতে প্রেসেন্ডেন্ট পুটিন বলেছেন, 'মুসলমানরা আমাদের দেশে থাকতে চাইলে, আমাদের দেশের নিয়ম মেনে চলতে হবে। শরিয়ার আইন এখানে অমান্য হবে'। অস্ট্রেলিয়ায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জুলিয়া গিলার্ডও সেই এক কথাই বলেছিলেন মুসলমানদের প্রতি। ■

হেফাজতে ইসলাম এখন আওয়ামি লিগের বন্ধু, ইসলামিকরণে তারাই হবে হাতিয়ার

ঢাকা থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি।। ঠিক পাঁচ বছর আগে একাত্তরের মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচারের দাবিতে মুক্তচিন্তার লেখকরা (ব্লগার ও অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট) রাজধানীর শাহবাগে আন্দোলনে নেমেছিলেন, আর অল্লামা শাহ আহমেদ শফির নেতৃত্বে কওমি মাদ্রাসা ভিত্তিক সংগঠন হেফাজতে ইসলাম তাদের প্রতিহত করতে রাজপথে নেমেছিল। সরকারের বিরুদ্ধে অবরোধের ডাক দিয়ে ২০১৩ সালের ৫ মে রাজধানীর মতিঝিলে শাপলা চত্বরে অবস্থান নিয়েছিল হেফাজতিরা। ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল রাজধানী জুড়ে। টেলিভিশন চ্যানেলের যে সব মহিলা সাংবাদিক খবর সংগ্রহের জন্য এসেছিলেন তাদের 'বেপর্দা' আখ্যায়িত করে মারধোর করে ক্যামেরা ভাঙচুর করা হয়েছিল। মতিঝিল পল্টনে বইপত্রের দোকানে ঢুকে ইসলামি বইপত্র ছাড়া অন্য সব বই পুড়িয়ে দিয়েছিল হেফাজতিরা। শেখ হাসিনাকে 'ইসলামের দুশমন' নামে আভিহিত করা হয়েছিল অবরোধ সমাবেশ থেকে। এই অবরোধ আন্দোলনে সমর্থন জানিয়েছিলেন বিএনপি চেয়ারপার্সন ও তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া। তিনি ৪৮ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়েছিলেন সরকারকে পদত্যাগের জন্য। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আওয়ামি লিগের নেতৃত্বাধীন মহাজোটের শরিক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের জাতীয় পার্টি আন্দোলনকারী হেফাজতিদের জন্য জল ও খাবারের ব্যবস্থা করেছিল। হেফাজতিদের ইসলামের সৈনিক বলে আখ্যায়িত করেছিলেন এরশাদ। হেফাজতিদের বোঝানো হয়েছিল, এভাবে অবরোধ অব্যাহত থাকলে এই 'ইসলাম বিরোধী' হাসিনা সরকারের পতন অবশ্যম্ভাবী। প্রমাদ গোনেন শেখ হাসিনা। রাতের মধ্যেই কড়া হাতে ব্যবস্থা নিয়ে রাজধানী অবরোধমুক্ত করতে হয়েছিল সরকারকে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানে কত হেফাজতির প্রাণহানি হয়েছিল তা নিয়ে পরবর্তীকালে অনেক বিতর্ক ও তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছিল।

হেফাজতে ইসলাম ১৩ দফা দাবি দিয়েছিল, যার অন্যতম ছিল 'নারীদের অন্দরমহলে রাখতে হবে। নারী নেতৃত্ব হারাম। নারীর কাজ শুধু সন্তান উৎপাদন, ঘরসংসার দেখা, রান্নাবান্না করা। এর বাইরে নারীর কোনও কাজ নেই।' ইসলামি নেতা আল্লামা শফি এও বলেছিলেন, 'নারীরা হলো তেঁতুলের মতো, দেখলেই মুখে লালা ঝরে।' অন্য ১২ দফায় যেসব দাবি উত্থাপন করা হয়েছিল সেসব দাবি মানা হলে দেশ এক অন্ধকার যুগে ফিরে যাবে। অন্য ধর্মের মানুষ বাংলাদেশে থাকতে পারবে না। সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিন্‌হা সুপ্রিম কোর্ট

প্রাঙ্গণে 'জাস্টিসিয়া' নামে এক নান্দনিক নারীমূর্তি স্থাপন করেছিলেন। সেই ভাস্কর্যকে হিন্দু সংস্কৃতি আখ্যায়িত করে হেফাজতে ইসলাম আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। একজন হিন্দুকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিল হেফাজতে, ভাস্কর্য স্থাপনের পর তাঁর অপসারণ দাবি করে। হেফাজতের বক্তব্য ছিল, পাশের ইদ্‌গা মাঠ দুটিতে ইদের সময় নমাজ হয়। নারীমূর্তির সামনে নামাজ জায়েজ হবে না। দাবি জানানো হয়, ভাস্কর্য সরিয়ে নেওয়ার। সেই দাবি সমর্থন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শেষ পর্যন্ত ভাস্কর্যটি সরিয়ে পিছনে নিয়ে যাওয়া হয়।

সেই হেফাজতে ইসলামকে, হঠাৎ দেখা গেল সাম্প্রতিক সময়ে শেখ হাসিনা ও আওয়ামি লিগের ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। হেফাজতের আমির শাহ আহমেদ শফি গণভবনে আমন্ত্রিত হলেন দলবলসহ। প্রধানমন্ত্রীর পাশে বসে কথা বললেন, নারী নেতৃত্ব মেনে নিলেন। মূলধারার পাঠ্যপুস্তক থেকে হেফাজতে প্রধানের 'নির্দেশ' অনুযায়ী হিন্দু ও প্রগতিশীল কবি-সাহিত্যিকদের লেখা বাদ দেওয়া হলো। তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি লেখাও আছে। যুক্ত হলো ইসলামি লেখা। যে হেফাজতের অনুসারী দেশের ১৩ হাজার ৯০২ টি কওমি মাদ্রাসায় কখনও জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় না হিন্দু কবির লেখা বলে, সেই শিক্ষাধারায় 'দাওরায়ে হাদিস'-কে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সমমর্যদা দেওয়া হলো। এই ডিগ্রি কোনও বিশ্ববিদ্যালয়র নয়, 'আল হাইয়াতুল উলয়া লিল জামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশ' নামে একটি কমিটি বা বোর্ডের মাধ্যমে দেওয়া হয়। এই কমিটি বা বোর্ডের প্রধান হেফাজত প্রধান শফি। সরকার স্বীকৃতি ঘোষণা করলেও এই কমিটি বা বোর্ডের প্রতি সরকারের কোনও স্বীকৃতি নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনও প্রতিনিধিও নেই বোর্ডে। চট্টগ্রামে হাটহাজারিতে সরকারি খাসজমি দেওয়া হয় হেফাজতের তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য। শিক্ষাবিদরা বলেছন,'দাওরায়ে হাদিস' স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সমমান হওয়ায় এরা সরকারি চাকরিতে যোগ দিতে পারবে, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় বসতে এখন আর তাদের বাধা নেই। এরা প্রশাসনে ঢুকবে, স্বাভাবিক ভাবে প্রশাসনে ইসলামের ব্যাপক প্রভাব পড়বে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অবশ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে পুরোপুরি রাজনৈতিক বলেই মনে করছেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন শিক্ষাবিদ বলেছেন, সরকারের এই সিদ্ধান্ত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা ইসলামিকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশ একদিকে জঙ্গি দমনের কথা বলছে, অন্যদিকে জঙ্গিবাদ বিকাশের ভিত্তি তৈরি করছে। হেফাজতে ইসলামের সঙ্গে আওয়ামি লিগের এই সখ্য বাংলাদেশে এক নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণ করেছে। আওয়ামি লিগের রাজনীতিতে হেফাজত নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করছে, এমন আশঙ্কা করছেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বুদ্ধিজীবীরা, যদিও তাঁরা প্রকাশ্যে এমন কথা বলতে নারাজ। তাঁরা এও বলছেন, জামায়াতে ইসলাম বিএনপিকে যেভাবে গ্রাস করেছে, ঠিক সেভাবেই হেফাজত মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া আওয়ামি লিগকে গ্রাস করেছে। বদলে যাচ্ছে বাংলাদেশ।■

গ্যাস নিয়ে বিষাক্ত 'গ্যাস' ছড়ানো হচ্ছে

সুব্রত দত্ত

'ফের দাম বাড়ল রান্নার গ্যাসের'— এই শিরোনামে বেশ কিছুদিন দু' একটি দৈনিক পত্রিকায় কিছু অর্ধসত্য সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে বিকৃত তথ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। আর এই সংবাদগুলোকে হাতিয়ার করে সম্পূর্ণ মিথ্যার বাজার খুলে বসেছে কালীঘাট ও আলিমুদ্দিনের রাজনৈতিক মাফিয়ারা। যারা একটা পঞ্চায়েত সদস্যের নির্বাচনের জন্য নমিনেশন থেকে শপথগ্রহণ পর্যন্ত পিস্তল বোমা ও অন্যান্য মারণাস্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে, প্রকাশ্যে মহিলাদের লাথি ঘুষি মেরে ক্ষমতা ধরে রাখার চেষ্টা করে তাদের মাফিয়া বলাই যায়। যাইহোক, এইসব বিকৃত সংবাদ পরিবেশনকারী ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক মাফিয়াদের গলাবাজির বিপরীতে আসল তথ্যের দিকে যদি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিপাত করা যায় তাহলেই গ্যাসের আসল ও নকল চেহারা বোঝা যাবে!

২০০৪ সালে ইউপিএ-১ যখন কেন্দ্রে সরকারে আসে তখন ভরতুকিযুক্ত গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ছিল ২৬৬.৭০ টাকা।

২০০৯ সালে ইউপিএ-১-এর শেষ দিনে বা ইউপিএ-২-এর প্রথমদিনে বেড়ে হয় ৩২৭.২৫ টাকা। বৃদ্ধি ২২.৭০ শতাংশ।

২০১৪ সালে ইউপিএ-২ সরকারের শেষ দিনে বা এনডিএ সরকারের প্রথমদিনে দাম বেড়ে হয় ৪১৬ টাকা। বৃদ্ধি ২৭.১১ শতাংশ।

এখন ১ নভেম্বরে দাম ৫০৮.৭০ টাকা, অর্থাৎ বৃদ্ধি ২২.২৮ শতাংশ।

দাম বৃদ্ধির হার কোন সময়ে বেশি এটা একটা পাঁচ বছরের বাচ্চা বলে দেবে।

চাপা সত্য আরও আছে...

২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে ইউপিএ-২ সরকার সিদ্ধান্ত নেয় চলতি আর্থিক বছরে ৬টি ভরতুকিযুক্ত সিলিন্ডার দেওয়া হবে, বাকি প্রয়োজনীয় সিলিন্ডার খোলাবাজারের দামেই কিনতে হবে। প্রবল বিক্ষোভের মুখে ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে সেটা পরিবর্তন করে ৯টা ভরতুকি যুক্ত সিলিন্ডার করা হয়। গৃহীদের প্রবল ক্ষোভের কথা আংশিকভাবে বিবেচিত হয় ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে। জানুয়ারি মাসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ২০১৪ সালের ১ এপ্রিল থেকে বছরে ১২ টা ভরতুকি যুক্ত সিলিন্ডার বরাদ্দ হবে প্রতি পরিবারে কিন্তু সেটা মাসে ১টা করেই পাওয়া যাবে।

২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুসারে বছরে ১২টা পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সিলিন্ডারের জন্য একটা পরিবারকে খরচ করতে হতো— (৪১২ × ৬) + (১০৩৮ × ৬) = ৮৭০০ টাকা।

২০১৪ সালের জানুয়ারিতে পাওয়া তথ্য অনুসারে ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে একটি পরিবারকে বছরে ১২টি সিলিন্ডার ব্যবহারের জন্য গড়ে খরচ করতে হতো— (৪১৬ × ৯) + (১২৭০ × ৩) = ৭৫৫৪ টাকা।

এখন ২০১৮-এর ১ নভেম্বরের গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে গেল গেল রব ওঠার সময়েও ২০১৭-এর ডিসেম্বর থেকে ২০১৮-এর নভেম্বর পর্যন্ত কেনা ভরতুকিযুক্ত ১২টি সিলিন্ডার কিনতে মোট ব্যয় ৫৯৯৫ টাকা।

তাহলে সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে এই সব সেকু-মাকু-মুলিদের?

সমস্যা নয়, গভীর সমস্যায় পড়ে গেছে একটা বিরাট সংখ্যক সুবিধাভোগী চক্র যারা নিম্নমধ্যবিত্তদের প্রাপ্য সরকারি ভরতুকি ছিনিয়ে নিত, লুঠ করে নিত।

ভারতবর্ষের মতো এই বিপুল জনবহুল দেশে বহু মধ্যবিত্ত- নিম্নবিত্ত এলপিজি গ্রাহক আছেন যারা সারা বছরে ৫/৬ টার বেশি সিলিন্ডার ব্যবহার করেন না, কিন্তু তাদের নামে ভরতুকিযুক্ত বাকি সিলিন্ডার গুলোও তোলা হয়ে যেত কোনও না কোনও পথ অবলম্বন করে তারপর সেগুলো খোলাবাজারের দামে অর্থাৎ ভরতুকিহীন মূল্যে বা তারও বেশি মূল্যে বিক্রি হয়ে যেত। ২০১৪ সালে গ্যাসের গ্রাহক সংখ্যা ছিল প্রায় ১৪ কোটি আর এই বছরের জানুয়ারি মাসে ভরতুকির পরিমাণ ছিল ৮৫৪ টাকা। ১০ শতাংশের কমেও যদি ধরে নেওয়া যায় ১ কোটি গ্রাহকও বছরে গড়ে ৮টি সিলিন্ডার ব্যবহার করেন এবং বরাদ্দ বাকি ৪টি সিলিন্ডার ছেড়ে দেন তাহলে অনেকটাই বোঝা যাবে কী বিপুল পরিমাণ অর্থের লেনদেন হতো এই ভরতুকির টাকা পকেটস্থ করে।

এই লুটপাটের চাকেই নরেন্দ্র মোদী ঢিল ছুঁড়েছেন। ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি পরিবর্তিত ডিবিটিএল স্কিমের মাধ্যমে ভারতবর্ষের সব জেলাতেই গ্যাস সিলিন্ডারের প্রাপ্ত ভরতুকি গ্রাহকদের ব্যাঙ্ক একাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে কেন্দ্রীয় সরকার। এর ফলে একটা যে সমান্তরাল অর্থ লেনদেন হচ্ছিল গ্যাসের ভরতুকিকে পণ্য হিসেবে গণ্য করে এবং তাতে শামিল ছিল মুষ্টিমেয় ধান্দাবাজ এক শ্রেণী— তারাই আজ ভরতুকিহীন গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে চিন্তিত। ■

চিঠিপত্র

অস্ত্রহীন দুর্গাপ্রতিমা!

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একটা ব্যঙ্গ কবিতায় আছে ''একটা নতুন কিছু করো, খুব খানিক লাফাও কিংবা খানিক ওড়ো।'' তা আমাদের স্বঘোষিত প্রতিমার থিমপন্থী বিপ্লবীদের মাথায় বৈপ্লবিক চিন্তা এল যে, এবার দুর্গাপ্রতিমার হাতগুলি তাঁরা খালি রাখবেন। এই মগজহীনরা বোধহয় জানে না এই দুর্গাপ্রতিমা রচিত হয় মহাচণ্ডীর বর্ণনা অনুসারে। সমস্ত দেবতার অস্ত্রে সজ্জিত হয়েই মা দুর্গা অসুর বধ করেন। মহাশক্তির আধারিতা দুর্গা তো বিনা অস্ত্রেই শুধুমাত্র হুংকারের দ্বারাই ধূম্রলোচনকে বধ করেন। কিন্তু মহিষাসুরকে বধ করার সময় তিনি অস্ত্র ধরেছিলেন এই কারণেই যে, ওই দিব্যাস্ত্রের ছোঁয়ায় পাপাত্মারা উদ্ধারলাভ করবে। দুর্গার করুণা সর্বত্র বিস্তৃত। পাপীরাও তাঁর করুণা থেকে বঞ্চিত নয়। এই জন্যই মা কালী ও দুর্গার খাঁড়া হিন্দুরা শ্রদ্ধাভরে মাথায় ঠেকায়। এই ঐতিহ্য কেন সেকুলারবাদীরা ভুলে গেল? যতদূর জানা যাচ্ছে 'সৃষ্টি -সুখের উল্লাসে' সেকুলারি এই কাণ্ড করেছে যে, এতে না কি দর্শনার্থী হিন্দু জনতার মধ্যে হিংসার ভাব জাগতে পারে এবং দাঙ্গা বাঁধতে পারে! এই বিচিত্র কল্পনা কি হিন্দুদের নিরস্ত্র ও নিবীর্য করে দেওয়ার অপপ্রয়াস নয়? হিন্দুদের ঘরে তো আত্মরক্ষার জন্য একগাছা লাঠিও থাকে না। এজন্য স্বামী প্রণবানন্দ বলে গেছেন দেবতাদের হাতে শক্তির প্রতীক অস্ত্র দেখেও হিন্দুদের কেন শক্তিমান হওয়ার প্রবৃত্তি জাগে না? মহালয়ার দিন দুর্গাবন্দনায় গাওয়া হয় 'দশপ্রহরণধারিণী তুমি জাগো'। বঙ্কিমচন্দ্র বন্দে মাতরমে গেয়েছেন 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী'। এই মতলববাজরা কি এগুলি জানেন না? এই অশাস্ত্রীয় প্রতিমার পূজা হতে পারে না। কিন্তু কিছু লোভী পুরোহিত পয়সার লোভে এই প্রতিমা পূজা করছে। এদের চিন্তা নেই ভাবনা নেই। সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ এদের মনে কি আঘাত সৃষ্টি করে না? এই সেকুলারবাদী হিন্দুরা মহরমের সময় মুসলমানদের অস্ত্র আস্ফালনের বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করতে সাহস করেন না। যত জ্ঞান, যত উপদেশ শুধু হিন্দুদের বেলায়? সব জায়গায় হিন্দুরাই বুঝি দাঙ্গা বাঁধায়? দাঙ্গা বাঁধিয়ে হিন্দুরাই কি ভারত ভাগ করেছিল? বোকা হিন্দুরা আত্মঘাতী চিন্তা পরিত্যাগ করে একটু মাথাটা খেলাও। শরীরকে দুর্বল করে বাইরের ভাইরাসকে তোমার ওপর আক্রমণে সাহায্য কোরো না।

—**প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়,**
পাটুলি, কলকাতা-৯৬।

হিন্দু নামে অ্যালার্জি কেন?

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্কুল শিক্ষা দপ্তর প্রকাশিত একটি পুস্তিকা দেখতে পেলাম— 'স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতামালা এবং পূর্বের ও পরের ঘটনাবলী'—এই নামে। স্বামীজীর শিকাগো ভাষণের ১২৫ তম বর্ষে পুস্তিকাটিকে স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্যই প্রকাশিত তা প্রথমেই বলা হয়েছে। কিন্তু বইটিতে শিকাগো বক্তৃতার আগে ও পরের ঘটনাবলী, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত ইত্যাদি দিলেও মূল যে বিষয়--- 'বক্তৃতামালা'— তা কিন্তু পুরো দেওয়া হয়নি। খুব সামান্য অংশ মাঝে মাঝে উল্লেখ করে সেটা নিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীরা জানতেও পারলো না স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোতে দাঁড়িয়ে ঠিক কী কী কথা বলেছিলেন।

শুধু তাই নয়, যে কৌশলে পুস্তিকাটি সম্পাদনা করা হয়েছে— তাও লক্ষ্য করার মতো। ১৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত স্বামীজীর ভাষণের অংশ— ''সব ধর্মের যিনি জননী স্বরূপ, তাঁর নামে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর ধন্যবাদ জানাচ্ছি সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের কোটি কোটি হিন্দু নর-নারীর পক্ষ থেকে।'' ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে শিকাগো বক্তৃতার শতবর্ষ পূর্তিতে বেলুড় মঠ 'শিকাগো বক্তৃতামালা' নামে যে বইটি প্রকাশ করেছিল তার থেকে ওই অংশটি পড়ছি— ''সর্বধর্মের প্রসূতিস্বরূপ যে সনাতন হিন্দুধর্ম, তাহার প্রতিনিধি হইয়া আমি আজ আপনাদিগকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং কী বলিব— পৃথিবীর যাবতীয় হিন্দুজাতির ও যাবতীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের কোটি কোটি হিন্দু নর-নারীর হইয়া আমি আজ আপনাদিগকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ জানাইতেছি'' (পৃ. ১৪)। পাঠক লক্ষ্য করুন— এখানে 'সনাতন' শব্দটি একবার ও 'হিন্দু' শব্দটিকে তিনবার বর্জন করা হয়েছে। এবং এই ভাবে আরও আছে। এই কাটছাঁটের পিছনে নিশ্চয়ই একটা অভিসন্ধি আছে। বইটির প্রাক্কথন থেকে জানতে পারলাম— রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দ এর পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন। তিনি কেন এটা সমর্থন করলেন— বুঝতে পারলাম না।

হিন্দুধর্মকে সনাতন ধর্ম বলা হয়, কারণ সদা বিস্তৃত হয়ে আছে এই ধর্ম। (সনাতন = সদা + তন্। তন্ মানে বিস্তার)। এর কোনও শুরু নেই... কোনও প্রতিষ্ঠাতা নেই। এর মধ্যে সংকীর্ণতা নেই। সবার জন্য অবারিত। সমস্তরকম উদার ভাবধারাই এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। তাই 'হিন্দুধর্ম' শিরোনামে যে বক্তৃতাটি বিবেকানন্দ ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ শিকাগো ধর্মসভায় দিয়েছিলেন সেটাই যদি উল্লিখিত পুস্তিকাটিতে পুরো ছাপা হতো তাহলেই এর মর্মার্থ ছাত্র-ছাত্রীরা সহজেই বুঝতে পারতো বলে আমি মনে করি।

কে না জানে--- বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্তাব্যক্তিদের হিন্দুধর্মের নামে একটা অ্যালার্জি আছে। 'হিন্দু' কথাটা শুনলেই এঁরা 'সাম্প্রদায়িক-সাম্প্রদায়িক' বলে লাফিয়ে ওঠেন আর উচ্চৈঃস্বরে গালমন্দ করতে শুরু করেন। এঁরা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা (অর্থাৎ নাস্তিকতা)-কে প্রশ্রয় দেন। অথচ বিবেকানন্দ বলেছেন--- ভারতবর্ষের প্রাণশক্তি রয়েছে ধর্মে। তোমরা যদি ধর্মকে কেন্দ্র না করে, ধর্মকে জাতীয় জীবনে প্রাণশক্তি না করে রাজনীতি, সমাজনীতি বা অন্য কিছুকে তার জায়গায় বসাও, তবে

তোমরা একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছু একটা করে দেখানোর তাগিদে এই 'শিকাগো বক্তৃতামালা' পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছেন—এটা বুঝতে পারা যায়। কিন্তু তা যদি সম্পূর্ণ ও অবিকৃত রাখতেন তাহলেই আরও ভালো হতো। স্বামী বিবেকানন্দই বলেছেন—'চালাকির দ্বারা কোনও মহৎ কাজ হয় না।'

—**অরুণ ঘোড়ই,**
লক্ষ্মীজনার্দনপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

সময়ের কাজ সময়ে করা বুদ্ধিমানের কাজ

পরে করব বলে কোনও কাজই ফেলে রাখা উচিত নয়। হয়তো পরে সে সুযোগ নাও আসতে পারে। যারা বুদ্ধিমান তারা কখনোই সময়ের ভরসা করে না। যখন সুযোগ আসে তখনি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে উদ্যোগী হয়। কারোরই সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত নয়। বর্তমান উদ্যমের ভাটা পড়তে কতক্ষণ। বহিরাগত আক্রমণকারীরা আমাদের দেশে এসে সে সুযোগ কাজে লাগিয়েছে। তারা এসেছে, মন্দির ভেঙেছে, মঠ ভেঙেছে, পুরানো স্মৃতি চিহ্নকে লোপাট করেছে। সময়ের জন্য অপেক্ষা করেনি। এমনকী বিভিন্ন স্থানের নামকে নিশ্চিহ্ন করতেও ছাড়েনি। যেমন তুঘলক বংশের সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক, তিনি ছিলেন পাগলা রাজা, অথচ জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। এই সুলতানের রাজধানী ছিল দিল্লি। কিন্তু তিনি মোঙ্গল আক্রমণের ভয়ে রাজধানী দিল্লিকে পরিত্যাগ করলেন। রওনা দিলেন দেবগিরির উদ্দেশে। এই দেবগিরি ভারতের মধ্যস্থানে অবস্থিত। তাই এটাকে রাজধানী হিসেবে বেছে নিলেন। তবে আর একটি বিষয়কে এই সুলতান বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দিলেন। দেবগিরির নাম পালটে রাখলেন দৌলতাবাদ। কারণ এটি ছিল তার প্রেস্টিজ ইস্যু। মুসলমান রাজা কখনও তার রাজধানী হিন্দুর নামে রাখতে পারে না। তেমনি এমন সুযোগকে প্রত্যেকেরই যথার্থ ভাবে কাজে লাগানো উচিত। এই পিছনে থাকা 'বাদ' শব্দগুলি বেছে বের করে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। বর্তমান ফৈজাবাদ হচ্ছে অযোধ্যা, আমেদাবাদ হবে কর্ণাবতী। এটাকে সবারই সাধুবাদ জানানো উচিত। কেউ যদি চোর থেকে সাধু হয় তাতে তো কারোর আপত্তি থাকার কথা নয়। যারা আপত্তি করবে তাদের বুদ্ধিভ্রম হয়েছে বলে ধরা হবে। বিকৃত নাম ইতিহাস বিকৃত করে। যার পিতৃপরিচয় এখনো বর্তমান সে তো কখনও অন্য পিতার নামে পরিচিত হতে পারে না। এক্ষেত্রে একটা ইতিহাস খ্যাত কথা বলা যেতেই পারে। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হরিহর ও বুক্ককে দিল্লিতে ধরে নিয়ে গিয়ে মহম্মদ বিন তুঘলকের আদেশে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল। পরে তারা কর্ণাটকে ফিরে এলে তাদের গুরুদেবের চরণামৃত খাইয়ে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। এতে কি এদের কোনও ক্ষতি হয়েছিল? তেমনি ধর্মান্তরিত নামকে যদি পরাবর্তন করা হয় তবে দোষের তো কিছু আছে বলে মনে হয় না। যে সমস্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এমন পরিবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে সেটা খুবই বাস্তবোচিত এবং মোক্ষম সিদ্ধান্ত। একটি উদাহরণ দিয়ে শেষ করব। একজন শিকারি হাতের কাছে একটি খরগোশ পেয়েছে। ইতিমধ্যে সে একটি হরিণকে দৌড়ে যেতে দেখল। তখন খরগোশকে ছেড়ে সে হরিণ ধরতে ছুটল। কিন্তু হরিণটাকে ধরতে না পেরে আবার খরগোশের দিকে তাক করল। কিন্তু কোনওটাকেই ধরা হলো না। কাজেই সবারই উচিত পরে বাঘ মারব চিন্তা না করে, হাতের কাছে যেটা আছে সেটাকে কাজে লাগানো।

—**স্বপন কুমার ভৌমিক,**
শান্তিপুর।

ভাষা ও জাতীয়তা

যখন কলকাতায় হোস্টেলে থাকতাম তখন পাহাড়ের কিছু ছেলে আমাদের সামনের ঘরে থাকতো। ওদের সঙ্গে আমাদের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। একদিন ওই ঘরের একটা ছেলে কথা প্রসঙ্গে মজার ছলেই বলে যে, 'আমরা থাকি এই রাজ্যে অথচ আমাদের বাঙ্গালি না বলে নেপালি বলে'। মজার ছলে সে কথার গুরুত্ব আজ খুব ভালো করে উপলব্ধি করছি। আমাদের দেশ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় নির্মিত। দেশের অঙ্গরাজ্যগুলি মূলত ভাষার ভিত্তিতে নির্মিত। কিন্তু সব ক্ষেত্রে কিন্তু ভাষাই সব নয়। না হলে হিন্দি বলয়ে এতগুলি রাজ্য হতো না। দেশ এক হওয়াতে এক রাজ্যের মানুষ অন্য রাজ্যে গিয়েছেন এবং একটা সময় তিনি সেই রাজ্যের ভাষাকে নিজের মাতৃভাষা করে নিয়েছেন। কিন্তু ভাষাভিত্তিক তার পরিচয় তার বাদ যায়নি। যেমন দুই পুরুষ আগে বাঙ্গালার কেউ হিন্দি বলয়ের রাজ্যে গিয়েছেন, তাদের বর্তমান প্রজন্ম হিন্দিতেই কথা বলেন, অথচ তাদের কিন্তু বাঙ্গালিই বলা হয়। যেটা কিন্তু কোনও মতেই কাম্য নয়। যেমন এই রাজ্যে যারাই স্থায়ীভাবে থাকেন তাঁদের মাতৃভাষা যাই হোক তাঁরা বাঙ্গালি। এই মানসিকতা আজকের ভারতে খুব প্রয়োজন।

অনেকে বিভিন্ন কথায় স্বাধীনতার সত্তর বছর পর বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু আমি তা বলবো না, কারণ এই দেশ হাজার হাজার বছরের পুরাতন আর দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে মানুষের যাতায়াতও সেই সময় থেকে। কিন্তু আজকে এই কথা বলতে হচ্ছে কারণ হিন্দু নাগরিকত্ব বিল নিয়ে অসমের কিছু অংশের আপত্তির কথা মাথায় রেখে। হিন্দুদের নাগরিকত্ব দিলে অসমের সংস্কৃতির কিছুই ক্ষতি হবে না, উল্টে একটা সময় আসবে যখন এই মানুষরাও অসমের সংস্কৃতির সঙ্গে এক হয়ে যাবেন। কারণ এটাই হাজার হাজার বছরের সংস্কৃতি। তাই এটা ভাষার উগ্র জাতীয়তা প্রকাশের সময় নয়, সময় এক দেশ এক জাতি রূপে নিজেদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলা। সরকার ও বিভিন্ন দেশপ্রেমী সংগঠনের এখন এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত যাতে বিভিন্ন ভাষা হলেও আগত প্রত্যেক হিন্দুকে নিয়েই এক অসম গড়ে তোলা যায়, যাতে ভবিষ্যতে সবাই অসমের সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নিতে পারে। আর পারবেই, কারণ এটাই হাজার হাজার বছরের ভারত, গুটিকয়েক বছরের 'ইন্ডিয়া' নয়।

—**পদ্মপ্রিয় পাল,**
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

ক্ষমতায়নের উৎসে রয়েছে নারীর সততা

অঙ্গনা

মালিনী চট্টোপাধ্যায়

নুসরত পারভিন

শরতে সারা প্রকৃতি যখন নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভাসিয়ে পদ্ম-শালুক ও কাশ ফুলে সজ্জিত হয়ে আনন্দময়ীকে অভ্যর্থনা জানায়, আমরাও মায়ের বন্দনায় মগ্ন হই। প্রতিমা নিরঞ্জন হয়, আসে লক্ষ্মী পুজো, তারও পরে কালীপুজো...সরস্বতী পুজো। ঋতুর পর ঋতু জুড়ে মাতৃশক্তির বন্দনা। ভাবতে বিস্ময় জাগে, যে সমাজ নারী দেবতার আরাধনায় রত হয়, সেই সমাজেই কেন মেয়েদের প্রতি এত বঞ্চনা? নিঃসন্দেহে মেয়েরা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সুযোগ পাচ্ছে, কিন্তু সমাজের সব স্তরের মেয়েরা নয়। এখনও ঘরে ঘরে নারী লাঞ্ছিত হয়। এখনও বহু পরিবারে শুধুমাত্র বিয়ে দেওয়ার জন্য যেটুকু শিক্ষা প্রয়োজন, ততটুকুই শিক্ষিত করা হয় মেয়েদের। তারপর শ্বশুরবাড়িতে পাঠানো হয়। সেখানে কারো কারো জীবনে শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজনের নির্যাতন হয় নিত্যসঙ্গী। যারা 'ভাগ্যবতী', তাদের নির্যাতন হয়তো সহ্য করতে হয় না, কিন্তু সমাজে সম্মানও তারা পায় না। সত্য বটে, 'সুশিক্ষিত মানুষ মাত্রেই স্বশিক্ষিত'; শিক্ষার সুযোগ না পেলেও নিজের চেষ্টায় নিজেকে সুশিক্ষিত করে তোলা যায়, কিন্তু অধিকাংশ নারীই তা জানে না। স্বামী, সন্তান ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সেবাতেই তাদের সারা জীবন কেটে যায়। রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'মুক্তি' কবিতার নায়িকা বলেছিল :

''এ সংসারে এসেছিলেম ন' বছরের মেয়ে,
তারপরে এই পরিবারের দীর্ঘ গলি বেয়ে
দশের-ইচ্ছা-বোঝাই-করা এই জীবনটা টেনে টেনে শেষে
পৌঁছিনু আজ পথের প্রান্তে এসে।''...

বর্তমানে ন' বছর বয়সে বিয়ে হয়-ই না। কিন্তু 'দশের-ইচ্ছা-বোঝাই-করা' জীবন টেনে টেনে কত নারী যে জীবন-সায়াহ্নে এসে পৌঁছয়, তা ইতিহাসে লেখা থাকে না। স্বামী-সন্তান-সংসার সামলে একটুকরো অবসর পেলে, সংবাদপত্রে বা বইতে কৃতী নারীদের সাফল্যের বিবরণ পড়ে তারা হয়তো ভাবে, আমরা তো একই ঈশ্বরের সন্তান! তবে কেন এই বঞ্চনা? আমার শৈশবে কেন এতটুকু সুযোগ পেলাম না? আত্মীয়-স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশীর চোখে আমার কোনও সম্মান নেই কেন?

ঈশ্বর অশেষ করুণাময়। কারো জন্যই তিনি নিজেকে উন্নত করার পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেন না। হয়তো একটি দরজা বন্ধ হয়ে গেল, প্রবল অধ্যবসায় ও ইচ্ছাশক্তির জোরে অন্যদিকে এগিয়ে গেলে দেখা যাবে ঈশ্বর আরেকটি পথ খুলে দিয়েছেন। সাম্প্রতিক অতীতে লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর জীবন তারই নিদর্শন। প্রথাগত ভাবে শিক্ষার সুযোগ না পেয়েও তিনি বঙ্গ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখিকা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অতি সম্প্রতি ৩৬ বছর বয়সী কাশ্মীরি কন্যা নুসরত পারভিন মালয়েশিয়ায় এক আন্তর্জাতিক সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় বিজেতার মুকুট জয় করেন। মাধ্যমিক পাশ করে বিয়ে করেছিলেন নুসরত। স্বামীর নির্যাতন ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী, তাও সহ্য করতেন, কিন্তু স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে আনেন। নুসরত অন্য পথে এগিয়ে যাওয়ার কথা ভাবেন, অবশেষে এলো সাফল্য। র‍্যাম্পে হাঁটার সময় অনভ্যস্ত নুসরত তিনবার পড়ে গিয়েছিলেন, উঠে দাঁড়িয়ে বিচারকদের ইকবালের কবিতা শোনান— 'গিরতে হ্যায় শহ সওয়ার হি ময়দান-এ- জঙ্গ মেঁ। ও তিফল কেয়া গিরেঙ্গে, তো ঘুঁটনো কো বল চলে।' যারা লড়াই করতে নামে, তারাই যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে যায়। যারা চলে না, তারা আর পড়ে যাবে কী করে!''

এশিয়াডে সফল হওয়া স্বপ্না বর্মন, হিমা দাস— প্রত্যেকের দারিদ্র্য ছিল নিত্যসঙ্গী। সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে অবশেষে সফল হয়েছেন তারা। তাই ওই জীবনযুদ্ধে হার না মেনে, স্বামী-সন্তান- সংসারকে সময় দিয়ে— যদি নিজের জন্য কিছুটা সময় শৈশবে সুযোগ থেকে বঞ্চিত মেয়েরা ব্যয় করে নতুন পথে এগিয়ে যায়, তবে সাফল্য আসবেই। কারণ যে সৎ পথে এগিয়ে চলতে চায়, ঈশ্বর তাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ■

অনিদ্রা ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

ঘুম বা নিদ্রা আমাদের জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। সুনিদ্রা দৈহিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ। কিন্তু অনিদ্রা একটি রোগ। প্রশ্ন হতে পারে, ঘুম কেন হয়? সারাদিন আমরা কাজকর্ম করি। এই সময় শারীরবৃত্তীয় পরিমণ্ডলে চলে নানা রকম কাটাছেঁড়া। ঘুমের সময় শরীর তা মেরামত করে নেয়। বিজ্ঞানীদের মতে জাগ্রত অবস্থায় মানুষের শরীরে সেরোটনিন নামে এক ধরনের নিউরো হরমোন তৈরি হয় যা মানুষের মস্তিষ্কে অবস্থিত নিদ্রাকেন্দ্রকে উত্তেজিত করে। এর প্রভাবে মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে। নিদ্রাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে চোখ জড়িয়ে আসে, আর হতে থাকে ঘুম। দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ঘুম হয়। তৃতীয় পর্যায়ে গভীরতর ঘুম এবং চতুর্থ পর্যায়ে গভীরতম নিদ্রা। নিদ্রার এই পর্যায়ের নাম বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন নন-র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট। ঘুমের সময় চোখের পাতা ঢাকা অক্ষিগোলক দ্রুত নড়াচড়া করে। সেই সময় চোখের ওপর নজর রাখলেই বুঝতে পারা যায়। ঘুমের পর্যায়গুলি চলে চক্রাকারে। প্রথমে নন র‍্যাপিড, পরে র‍্যাপিড। এভাবে চলে ৯০ মিনিটের এক একটি চক্র।

কার কতক্ষণ ঘুমানো উচিত ঃ

সুস্বাস্থ্যবান সদ্যোজাত শিশু দিনে-রাতে ১৬ ঘণ্টা ঘুমায়। এই ১৬ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় আধ ঘণ্টা চলে র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট। ১৬ বছর বয়সের ছাত্র-ছাত্রীরা ঘুমায় ১০-১১ ঘণ্টা। কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীদের সাড়ে আট ঘণ্টা ঘুমানো প্রয়োজন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের প্রয়োজনীয়তা কমতে থাকে। ৫০ থেকে ৬০ বছর বয়সিদের সাড়ে সাত ঘণ্টা ঘুমালেই চলে। তার চেয়ে কম ঘুমালেও ক্ষতি নেই। তবে ৫০ বছর পর চতুর্থ পর্যায়ের নিদ্রা থেকে অনেকে বঞ্চিত হন। সম্প্রতি আবিষ্কৃত একটি তথ্য হলো, একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ ও সবল মানুষের দু'ঘণ্টা ঘুম হলেই সারাদিন কাজকর্ম করতে অসুবিধা নেই। তবে ঘুম হয়নি বলে যদি না ভাবেন।

কিছু মানুষ অনিদ্রা রোগে ভোগেন। অ্যালোপ্যাথি ঘুমের ওষুধ দীর্ঘদিন খাওয়ার ফলে নানা রকমের উপসর্গ দেখা দেয়। হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেলে সেরকম কোনও কিছু ঘটার সম্ভাবনা নেই। বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ কেন্টের স্ত্রী মারাত্মক রকমের অনিদ্রা রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খেয়ে কোনও কাজ হচ্ছিল না। সেই সময় ডাঃ কেন্টকে একজন ডাঃ বেলিনির কথা বলেন। ডাঃ কেন্ট তাঁর স্ত্রীকে দেখানোর জন্য ডাঃ বেলেনিকে তাঁর বাড়িতে আসতে অনুরোধ করেন। ডাঃ বেলেনিকে দেখে ডাঃ কেন্টের এতটুকু বিশ্বাস জাগেনি। ডাঃ বেলিনি কেন্টের স্ত্রীকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে দু'দাগ ওষুধ দিয়ে বলেছিলেন, এক দাগ ওষুধ খাইয়ে দেখুন অবশ্যই ঘুম আসবে। যদি ঘুম আসে তাহলে বাকি ওষুধটা ফেলে দেবেন। স্ত্রীকে ওষুধ খাইয়ে ডাঃ কেন্ট তাঁর চেম্বারে চলে যান। ফিরে এসে ভয়ানক দুশ্চিন্তায় পড়লেন তিনি। কারণ বহুবার দরজায় ধাক্কা দেওয়া সত্ত্বেও দরজা খুলছিলেন না তাঁর স্ত্রী। কেন্ট বাধ্য হয়ে প্রতিবেশীদের সাহায্য চান। প্রতিবেশীদের সাহায্যে তিনি দেখতে পান যে তাঁর স্ত্রী অঘোরে ঘুমাচ্ছেন। বিস্মিত কেন্ট বলেন, আমরা এত ওষুধ দিলাম, তাতে কাজ হলো না, আর মাত্র এক দাগ ওষুধ খেয়ে আমার স্ত্রী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলেন। এই ঘটনা ডাঃ কেন্টকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ডাঃ কেন্ট আমেরিকা তথা বিশ্বের প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হয়ে উঠেছিলেন।

অনিদ্রা রোগের লক্ষণ অনুযায়ী ওষুধ ব্যবহার করতে হবে। ভয় হেতু অনিদ্রায় অ্যাকোনাইট। স্নায়ুর অবসাদের জন্য অনিদ্রায় আগারিকাস। অতিরিক্ত আনন্দ ও দুশ্চিন্তার জন্য অনিদ্রায় কফিয়া। নিদ্রা আসা মাত্রই ঘুমের জন্য কোনিয়াম। কাশির জন্য অনিদ্রায় হায়োসায়মাস। পেটে বায়ুজনিত কারণে অনিদ্রায় লাইকোপডিয়াম। পেটের গণ্ডগোল জনিত অনিদ্রায় নাক্সভুমিকা। একটি চিন্তা বার বার মাথায় আসার কারণে অনিদ্রায় ওপিয়াম। দিনে নিদ্রা, রাতে অস্থিরতায় সোরিনাম। চুলকানির জন্য অনিদ্রায় সালফার। শিশুর দাঁত ওঠার যন্ত্রণায় অনিদ্রা, শিশু ঘুমানোর সময় চিৎকার করে কাঁদলে বোরাক্স। দিনে নিদ্রা নিদ্রা ভাব, রাতে অনিদ্রায় স্ট্যাফিসেগ্রিয়া। কৃমিজনিত অনিদ্রায় টিউক্রিয়াম। স্বপ্ন ও ভয় জনিত অনিদ্রায় বেলেডোনা ৩০। স্নায়বিক উত্তেজনা জনিত অনিদ্রায় প্ল্যাসিফ্লোরা।

তবে কখনই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। কারণ চিকিৎসক তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে ওষুধের শক্তি নির্বাচন করে থাকেন, যা চিকিৎসাশাস্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

(যোগাযোগ-৯৮৩০০২৩৪৮৭)

লঘু উদ্যোগ ভারতীর দীপাবলী মিলন সভা

‘ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক হওয়া গর্বের বিষয়। ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে যারা নিঃস্বার্থভাবে দেশের জন্য কাজ করছে তাদের এক মঞ্চে আনার দায়িত্ব নিয়েছে লঘু উদ্যোগ ভারতী।’ গত ১৮ অক্টোবর কলকাতা মানিকতলার কল্যাণ ভবনের সভাগৃহে পশ্চিমবঙ্গ লঘু উদ্যোগ ভারতীর তত্ত্বাবধানে দীপাবলী মিলন সভায় কথাগুলি বলেন বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদ তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ ড. জিষ্ণু বসু। অনুষ্ঠানে সিদ্ধিদাতা গণেশের প্রতিমূর্তিতে মাল্যদান এবং প্রদীপ প্রজ্বলন করেন গৌড়ীয় মঠের পূজ্য বন্ধগৌরব ব্রহ্মচারী। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন লঘু উদ্যোগ ভারতীর পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি সমীর পাল। তিনি সংগঠনের রূপরেখা সম্পর্কে আলোচনা করেন। অখিল ভারতীয় যুগ্ম সম্পাদক সুধীর দাঁতে সংগঠনের সর্বভারতীয় রূপরেখা বর্ণনা করেন।

বেলুড়ে লোকপ্রজ্ঞা সম্মেলন

গত ১৮ নভেম্বর বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় (বেলুড় মঠ) পরিসরে প্রজ্ঞাপ্রবাহ-এর দক্ষিণবঙ্গ শাখার উদ্যোগে সারাদিন ধরে লোকপ্রজ্ঞা সম্মেলন হয়ে গেল। দক্ষিণবঙ্গের ৩০টি স্থান থেকে ১৬০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। বেদমন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ড. রাকেশ দাশ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী বেদ চর্চার

উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, সংস্কৃত ভাষা পড়তে হবে সংস্কৃত ভাষাতেই। বৌদ্ধিক স্তরে ভারতীয় সংস্কৃতিকে আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে সনাতন ধর্মকেই আশ্রয় করে। একমাত্র সনাতন ধর্ম অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির ভিত্তিতেই ভারত বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য সুভাষ সাহা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রবীর মজুমদার। প্রজ্ঞাপ্রবাহের সর্বভারতীয় সংযোজক জে. নন্দকুমার প্রতিনিধিদের প্রশ্নের উত্তরদানের মাধ্যমে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের শেষে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন ডাঃ উচ্ছল ভদ্র। সমগ্র সম্মেলনটি পরিচালনা করেন প্রজ্ঞাপ্রবাহ-এর পূর্ব ক্ষেত্র (পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা) সংযোজক অরবিন্দ দাস।

মহর্ষি দধীচি সেবা ট্রাস্টের দীপাবলী সম্মেলন

কলকাতা বিশিষ্ট সমাজসেবী সংস্থা মহর্ষি দধীচি সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে গত নভেম্বর মাসে ব্যাপক উৎসাহের সঙ্গে দীপাবলী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী অশোক কুমার শর্মা। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথির

আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে হরিপ্রসাদ পালোড় এবং সুধীর অসোপা। প্রদীপ প্রজ্বলন ও লক্ষ্মীস্বরূপ মাতেশ্বরী দধিমতীর বন্দনা দিয়ে সম্মেলনের শুভারম্ভ হয়। ট্রাস্টের অধ্যক্ষ কেশব দেও তিওয়ারী সবাইকে স্বাগত জানান।

অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ‘কৌন বনেগা করোড়পতি’র অনুকরণে ‘কৌন বনেগা চ্যাম্পিয়ন’-এর আয়োজন করা হয়। এই ক্যুইজে ১২ থেকে ২০ বছরের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। সবাইকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে সর্বাঙ্গ রূপদানে ছিলেন ওমপ্রকাশ ডোবা, সীতারাম তিওয়ারী, আশারাম কাকড়া, বালকিশন অসোপা, দেবকীনন্দন পালোড় প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বংশীধর শর্মা।

পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন প্রাথমিকভাবে এগিয়ে বিজেপি-ই

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

দক্ষিণী সুপারস্টার রজনীকান্ত একটি মোক্ষম কথা বলেছেন। বলেছেন— একজনকে মোকাবিলা করতে যদি দশজন আসরে নামে, তাহলেই বোঝা যায় আসল শক্তিধর কে। রজনীকান্তের বক্তব্যের মূল নির্যাসটি কারও বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। বস্তুত হয়েছেও তাই— একজনকে মোকাবিলা করতে দশজনই আসরে নেমেছেন। নরেন্দ্র মোদী বনাম কংগ্রেস, সমাজবাদী, তৃণমূল কংগ্রেস, এন সি পি, তেলুগু দেশম, ডি এম কে, বামপন্থী দলগুলি, মায়াবতী, আপ। এবং এও অস্বীকার করে লাভ নেই যে, এই বিরোধীরাই লড়াইটিকে বিজেপি বনাম বিরোধী জোটের বদলে নরেন্দ্র মোদী বনাম বিরোধী জোটের লড়াইয়ে পরিণত করেছেন। সাম্প্রতিক অতীতে কোনও বিশেষ এক রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে সমগ্র বিরোধী শক্তিকে একজোট হতে খুব একটা দেখা যায়নি। এখানেই নরেন্দ্র মোদীর সাফল্য। ভারতের রাজনীতিতে তাঁর গুরুত্বকে তাঁর বিরোধীরাই স্বীকৃতি দিয়ে দিয়েছে। এবং বিরোধীরা এটা কার্যত স্বীকারও করেছে যে, এককভাবে নরেন্দ্র মোদীকে মোকাবিলা করার মতো নেতা তাদের শিবিরে একজনও নেই। ফলে রাজনীতির ময়দানে অহি-নকুল সম্পর্ক এমন সব নেতাকে এখন মোদী-বিরোধিতার তাগিদে হাত মেলাতে হচ্ছে। পাঁচ রাজ্য বিধানসভা— রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা এবং মিজোরামে যে নির্বাচন প্রক্রিয়া এখন চলছে— সেখানে সব কিছুকে ছাপিয়েই প্রধান হয়ে উঠেছেন সেই নরেন্দ্র মোদী। বিরোধীদের প্রচারে, বিশেষত কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর প্রচারে, ওই পাঁচটি রাজ্যের স্থানীয় ইস্যুগুলি ছাপিয়ে বারবার উঠে আসছে নরেন্দ্র মোদী প্রসঙ্গ। যেন, নরেন্দ্র মোদীর ছায়া থেকে তারা বেরোতে পারছেন না কিছুতেই। ফলে, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে এই পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনও এক কথায় হয়ে উঠেছে নরেন্দ্র মোদী বনাম বিরোধীদের সেমিফাইনাল। এই সেমিফাইনালে যে এগিয়ে থাকবে, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে তার অবস্থা হবে সুবিধাজনক। প্রশ্নটা হচ্ছে— এগিয়ে থাকবে কে?

সম্প্রতি কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য এ কে অ্যান্টনি তাঁর পেশ করা একটি অভ্যন্তরীণ রিপোর্টে কংগ্রেস নেতৃত্বকে সতর্ক করেছেন। অ্যান্টনি তাঁর রিপোর্টে বলেছেন, কংগ্রেসের অতিরিক্ত মুসলমান তোষণের রাজনীতি তাকে একটা হিন্দু বিরোধী ভাবমূর্তি দিয়েছে। এটা কংগ্রেসকে রাজনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। খুব ভুল কিছু বলেননি অ্যান্টনি। অতিরিক্ত মুসলমান তোষণের রাজনীতির ফলেই কংগ্রেস উত্তর ভারতের হিন্দি বলয়ে তার জনপ্রিয়তা দ্রুত খুইয়েছে। এখন এর প্রায়শ্চিত্ত করতে এবং হিন্দু মন জয়ের লক্ষ্য নিয়ে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী নরম হিন্দুত্বের পথ নিয়েছেন। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়ের নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে হিন্দু মন্দিরে মাথা ঠুকছেন। কিন্তু চিঁড়ে এতে ভিজবে কি? অ্যান্টনির রিপোর্টেই প্রমাণিত হিন্দু জনমানসের আস্থা কংগ্রেস হারিয়েছে। এবং সে আস্থা পুনরুদ্ধারের তেমন সম্ভাবনাও নেই। পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনী প্রক্রিয়া যখন চলছে, ঠিক তখনই রামমন্দির মামলায় সুপ্রিম কোর্ট একটি অবাক করা সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, রামমন্দির মামলা তাদের অগ্রাধিকারের তালিকায় নেই। অতএব এই মামলার শুনানি কবে হবে— তা ঠিক হবে জানুয়ারি মাসে। রামমন্দির মামলার শুনানি পিছিয়ে দেওয়ার দাবি কংগ্রেস অবশ্য অনেক আগেই করেছিল। এই মামলার রায় রামমন্দিরের পক্ষে গেলে যে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ঝড়কে রোখা যাবে না— এ আশঙ্কা কংগ্রেসের আছে। ফলে, সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্ত কংগ্রেসকে খুশি করতে পেরেছে। কংগ্রেস তাদের খুশি প্রকাশ করে ফেলেছে। রামমন্দির নিয়ে কংগ্রেসের এই ভূমিকা রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়ে তাদের বিরুদ্ধেই যেতে পারে। মনে রাখতে হবে, এই তিন রাজ্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটদাতা হিন্দু। রামমন্দির নিয়ে একটি আবেগ তাদের ভিতরে সবসময়ই কাজ করে। সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্ত স্বাভাবিকভাবেই তাদের আবেগে আঘাত করবে। এবং কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তের পক্ষে এরকম ধারণা যদি হয়ে যায় এই তিন রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ভোটদাতাদের ভিতর— তাহলে বলতেই হচ্ছে, বিধানসভা নির্বাচনে এই তিন রাজ্যেই কংগ্রেস বিপদে পড়বে। প্রাক-নির্বাচনী সমীক্ষা যারা করেছেন— তারা রামমন্দিরের এই অঙ্কটিকে মাথায় রাখেননি। না রেখেই তারা কেউ কেউ বলেছিলেন— রাজস্থানে কংগ্রেস-বিজেপির এবার লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি। কেউ কেউ বলছেন— এবার রাজস্থানে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসবে। কেননা, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সরকারে বদল আনাটাই রাজস্থানের ভোটদাতাদের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তের পর রামমন্দির আবেগ যেভাবে ক্রমশই তপ্ত হয়ে উঠছে— তাতে এই সমীক্ষা বিফলেও যেতে পারে। রাজস্থানের কেল্লা দখল কংগ্রেসের কাছে অত সহজ না-ও হতে পারে।

রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়— এই তিনটি রাজ্যেই বর্তমানে বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে। এর মধ্যে মধ্যপ্রদেশ এবং

ছত্তিশগড়ে গত পনেরো বছর ধরে বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে। ক্ষমতায় থাকলে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার মুখোমুখি হতেই হয়। ফলে, এই তিন রাজ্যেও প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা রয়েছে— তা অস্বীকার করা যাবে না। তৎসত্ত্বেও প্রাক্-নির্বাচনী সমীক্ষাগুলিতে মধ্যপ্রদেশে এবং ছত্তিশগড়ে সকলেই বিজেপিকে এগিয়ে রেখেছে। অর্থাৎ, এই রাজ্যগুলিতে বিজেপি কিছুটা এগিয়ে থেকেই তাদের নির্বাচনী দৌড় শুরু করেছে। মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়ে বিজেপির এগিয়ে থাকার একটি বড় কারণ— যথাক্রমে এই দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান এবং রমণ সিংহ। দুই রাজ্যেরই ভোটদাতারা এখনো পর্যন্ত এই দুই মুখ্যমন্ত্রীর বিকল্প হিসাবে কাউকে ভাবতে পারছেন না। ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী রমণ সিংহের বিরুদ্ধে কার্যত সেরকম কোনও বিরোধী নেতৃত্ব নেই। অজিত যোগী কংগ্রেসে থাকাকালীন এখানে কংগ্রেসের পায়ের নীচে রাজনৈতিক জমি কিছুটা ছিল। সেই অজিত যোগী কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তবে, একক ক্ষমতায় যে তিনি বিজেপিকে মোকাবিলা করবেন বিষয়টা এমনও নয়। এই রাজ্যে অজিত যোগী আর মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টি জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে লড়ছে। কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলায়নি তারা। ফলে রাহুল গান্ধীর স্বপ্নের বিরোধী জোট ছত্তিশগড়ে এসে ধাক্কা খেয়েছে। এই নির্বাচনী অঙ্কে বিজেপি এই রাজ্যে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। তদুপরি, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে কেন্দ্র সরকারের অনেকগুলি প্রকল্প সফলতার সঙ্গে রূপ দিতে পেরেছে এই তিন রাজ্যের বিজেপি সরকার। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে উজ্জ্বলা প্রকল্পের আওতায় যথাক্রমে ৫.৩ মিলিয়ন এবং ৪.০১ মিলিয়ন পরিবার ভরতুকিতে রান্নার গ্যাস পাচ্ছেন। মুদ্রা প্রকল্পের আওতায় মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে যথাক্রমে ৯ মিলিয়ন এবং ৫ মিলিয়ন মানুষ ঋণের সুবিধা পেয়েছেন। গ্রামীণ গৃহসংস্থান প্রকল্পে মধ্যপ্রদেশে ১ মিলিয়ন এবং রাজস্থানে ৪০ লক্ষ পরিবার উপকৃত হয়েছেন। জনধন প্রকল্পে রাজস্থানে ২ লক্ষ ৫৪ হাজার এবং মধ্যপ্রদেশে ২৮.৮ মিলিয়ন অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার আওতায় মধ্যপ্রদেশে ২১০০ এবং রাজস্থানে ১৩ হাজার কিলোমিটার রাস্তা নির্মিত হয়েছে। তুলনায় ছত্তিশগড় অনেক ছোটো রাজ্য হলেও সেখানেও এই প্রকল্পগুলির আওতায় উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে। তদুপরি এই রাজ্যের পিছিয়ে পড়া এলাকায় সস্তায় চাল পৌঁছে দিয়ে রমণ সিংহের সরকার জনসমর্থন গড়ে তুলেছেন। এই কাজের অনেকটাই সুফল যে তিন রাজ্যেই বিজেপি সরকার পাবে, তাও বলার অপেক্ষা রাখে না। এই কথা মাথায় রেখেই কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর বলেছেন, প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা থাকলেও, আমরা তাকে জয় করেই এগিয়ে যাব।

এই পাঁচ রাজ্যের ভিতরে ছত্তিশগড়ে প্রথম দফার নির্বাচন সংঘটিত হয়েছে। প্রথম দফার নির্বাচন হয়েছে মাওবাদী অধ্যুষিত ১৮টি বিধানসভা কেন্দ্রে। এইসব কেন্দ্রগুলিতে আগে ভোটদানের হার কম থাকলেও এবার যাবতীয় হিংসা উপেক্ষা করে ৭০ শতাংশ ভোট পড়েছে। এটা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। মাওবাদী অধ্যুষিত এই অঞ্চলের মানুষদের কাছেও রমণ সিংহের নেতৃত্বাধীন সরকার সস্তায় চাল পৌঁছে দিতে পেরেছে। ফলে যে বিপুল শতাংশ ভোট পড়েছে তার একটা বড় অংশ সন্ত্রাস উপেক্ষা করে সরকারকে সমর্থন জানাতে এগিয়ে আসবে এমন আশাও করা যায়। সেক্ষেত্রে বরাবর কংগ্রেসের দখলে থাকা এই ১৮টি বিধানসভা কেন্দ্রে এবার কংগ্রেস কতটা সফল হবে— তা নিয়েও সংশয় থেকেই যায়।

মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়ে বিজেপির প্রধান বিরোধী কংগ্রেসে আরও একটি সমস্যায় আক্রান্ত। তা হলো গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। ছত্তিশগড়ে রমণ সিংহকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো সেরকম নেতা কংগ্রেস নেই। মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসে আবার কমলনাথ, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এবং অশোক গেহলতের ভিতর দ্বন্দ্ব স্বয়ং কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি রাহুল গান্ধীকে চিন্তিত রেখেছে। মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়ে শিবরাজ সিংহ চৌহান এবং রমণ সিংহের যেমন একছত্র নিয়ন্ত্রণ আছে রাজ্যে দলীয় সংগঠনের ওপর, কংগ্রেসের তা নেই। সেক্ষেত্রে এই দুই রাজ্যেই বিজেপির মোকাবিলা করা কংগ্রেসের পক্ষে কঠিনই হবে।

বাকি রইল তেলেঙ্গানা এবং মিজোরাম। তেলেঙ্গানায় ক্ষমতায় রয়েছে চন্দ্রশেখর রাওয়ের নেতৃত্বাধীন তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় কংগ্রেস। চন্দ্রশেখর রাও প্রথম দিকে মোদী-বিরোধীদের সঙ্গে হাত মেলালেও সর্বপ্রথমে তিনিই বিরোধী জোট ত্যাগ করেছেন। রাওয়ের সঙ্গে এখন বিজেপির সুসম্পর্ক। এই রাজ্যে তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় কংগ্রেস এবং বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রয়েছে চন্দ্রবাবু নাইডুর তেলুগু দেশম এবং কংগ্রেসের জোট। অন্ধ্রপ্রদেশের রাজনীতিতে তেলুগু দেশমের উত্থানই প্রবল কংগ্রেস বিরোধিতা করে। এবং কংগ্রেস বিরোধিতার রাজনীতিতেই এতদিন তারা অন্ধ্রে রাজনৈতিক সাফল্য পেয়ে এসেছে। শুধুমাত্র মোদী বিরোধিতা করতে গিয়ে সেই তেলুগু দেশম চন্দ্রবাবু নাইডুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধেছে। স্বাভাবিক ভাবেই, তেলুগু দেশমের সমর্থক এক বড় অংশের ভোটার এই জোটকে ভালোভাবে নিচ্ছে না। সেক্ষেত্রে কংগ্রেসের হাত ধরে চন্দ্রবাবু তেলেঙ্গানায় কতটা সাফল্য পাবেন— তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। এছাড়া, প্রাক-নির্বাচনী সমীক্ষাগুলি কিন্তু এখন পর্যন্ত তেলেঙ্গানায় তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের বিপর্যয় দেখায়নি। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গত কয়েক বছরে বিজেপির উত্থান হয়েছে দ্রুত। বলতে গেলে, উত্তর-পূর্বের অধিকাংশ রাজ্যই এখন বিজেপির দখলে। এর প্রধান কারিগর অসমের হিমন্ত বিশ্বশর্মা। মিজোরামের নির্বাচনে বিশ্বশর্মা কী ম্যাজিক দেখাতে পারেন, তারই ওপর নির্ভর করছে লালথানহাওলার নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারকে সরিয়ে মিজোরামে এবার বিজেপি সরকার গড়তে পারে কিনা। তবে মিজোরামে জয়ের বিষয়ে বিজেপি নেতৃত্ব যথেষ্ট আশাবাদী।

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে এই পাঁচটি রাজ্যের নির্বাচন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্বপূর্ণ এই কারণেই যে, এই নির্বাচন থেকেই আঁচ করা যাবে ২০১৯-এর হাওয়া কোনদিকে বইবে। প্রাথমিক আন্দাজে এটুকু অন্তত বলাই যায়— হাওয়া বিজেপিরই অনুকূলে। ■

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

হার নিশ্চিত বুঝে মধ্যপ্রদেশে দিশেহারা কংগ্রেস

ড. জিষ্ণু বসু

মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেস দল এবার ইস্তেহার ছাপায়নি। ছাপিয়েছে 'বচনপত্র', মানে প্রতিশ্রুতি। সেই বচনপত্রে দুটি অদ্ভুত কথা বলা হয়েছে। প্রথমটি হলো, সরকারি কোনও দপ্তরে আর এস এসের শাখা লাগানো যাবে না। মানে মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে সরকারি ভবনে আর এস এসের শাখা লাগবে না। আর দ্বিতীয়টি হলো কোনও সরকারি কর্মচারী আর এস এস করতে পারবেন না। প্রকৃতপক্ষে এই 'বচন' বা প্রতিশ্রুতি আসলে ভাঁওতা। এই 'বচনপত্র' বের হওয়ার পরে বহু কংগ্রেস নেতাকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করছেন, 'ঠিক কটি সরকারি ভবনে শাখা লাগে?' কোনও উত্তর নেই। আসলে প্রভাত বা সায়ম্ শাখা সাধারণত খোলা মাঠেই হয়। সরকারি বাড়িতে হতে যাবে কেন? অতিরাত্রি শাখা মুম্বই বা দিল্লির মতো মধ্যপ্রদেশে প্রচলিত নয়। দু' এক স্থানে হলেও সরকারি বাড়িতে রাত্রে শাখা হওয়া একেবারে কষ্টকল্পনা। দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতিরও কোনও মানে নেই। কারণ কংগ্রেস স্বাধীনতার পর থেকেই সরকারি কর্মচারীদের রাজনৈতিক সংগঠনে যোগদানের বিষয়ে 'সার্ভিস রুল' তৈরি করেছে। সঙ্ঘ রাজনৈতিক সংগঠন না হলেও কংগ্রেসের সরকার রাজ্যে বা কেন্দ্রে থাকলে বহুবার নিরপরাধ স্বয়ংসেবক কার্যকর্তাদের কষ্ট দিয়েছে। তাই নতুন করে ভয় দেখাবার কিছু নেই।

এই 'বচনপত্রে' আর এস এস বধের প্রতিশ্রুতির অর্থ কংগ্রেস তার যে হিন্দু-বিরোধী অবস্থান ত্যাগ করেনি তার বার্তা দেওয়া। কারণ কংগ্রেসের তঞ্চকতা সারা দেশের হিন্দুরা বুঝে ফেলেছে। তাই হিন্দুদের ভাঁওতা দিতে এবারে গেরুয়া ধুতি আর সাদা কুর্তা পরে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী মন্দিরে মন্দিরে ঘুরছেন। দাতিয়ার পীতাম্বরপীঠ মন্দিরে বাবু হয়ে বসে পুজো দিয়েছেন। তারপর অক্টোবর মাসের শেষ তিনি উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরেও গিয়েছিলেন। তাই পাছে তার গায়ে হিন্দুত্বের তকমা না লেগে যায় তার জন্যই আর এস এসকে গালিগালাজ করা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা কংগ্রেসের হিন্দু বিরোধী ভেক ধরাটাকেই এর মূল উদ্দেশ্য হিসাবে দেখছেন।

এর মধ্যে কংগ্রেস নেতা কমলনাথের একটি ভিডিও সংবাদমাধ্যমে এসেছে। যেখানে উনি একদল মুসলমানকে আর এস এসের ভয়াবহ রূপের কথা বোঝাচ্ছেন। সঙ্গে এটাও বলছেন যে ২৮ নভেম্বরের পরে কংগ্রেসই এদের নিকেশ করবে। তাই তথ্যাভিজ্ঞ মহল প্রশ্ন তুলেছে যে, মানুষে মানুষে বিভেদের পাঁচিল তোলার কাজটা আর এস এস নয়, আদতে কংগ্রেসের নেতারাই করছেন। আর গণতন্ত্র, সৌজন্য বোধ কোনও কিছুর পরোয়া না করেই নির্লজ্জভাবে করছেন। অর্থাৎ মাওবাদ নয়, আতঙ্কবাদ নয়, বিজেপি শাসনের দোষগুণ কিছুই নয়, কংগ্রেসের সামনে সর্ববৃহৎ সমস্যা হলো আর এস এস। কংগ্রেস সরকার যতদিন কেন্দ্রে ক্ষমতায় ছিল ততদিন মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড়ের মতো রাজ্যগুলিতে সমস্যার কথা উঠলেই কেন্দ্রীয় নেতা মন্ত্রীদের মুখে থাকত মাওবাদ বা অতিবামপন্থার নাম। আজ সবকিছুকে ছাপিয়ে নেতাদের মুখেও দলের ইস্তাহারে কেবলমাত্র আর এস এস।

অথচ প্রকাশ্যে কংগ্রেস বলছে, মধ্যপ্রদেশেই নাকি 'প্রতিষ্ঠান বিরোধী' ভোট বেশি পাবে মনে করছে। বহু টাকা খরচ করে তারা পার্টির মধ্যেই একটি 'ডেটা অ্যানালিটিক ডিপার্টমেন্ট' চালু করেছে। যার দায়িত্বে আছেন প্রবীণ চক্রবর্তী। তাদের হিসেব মতো 'অ্যাংগার ইন্ডেক্স' সবচেয়ে বেশি মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহানের বিরুদ্ধে। যার পরিমাণ ৪.৩। সেখানে রাজস্থানে এই ইন্ডেক্স ৩.০ আর ছত্তিশগড়ে ২.৮। মানে রাজ্যের সবচেয়ে বেশি সাধারণ মানুষ শিবরাজ চৌহানের উপর রেগে আছে। তাহলে কংগ্রেস রাজ্যসরকারের ব্যর্থতা, দুর্নীতি ইত্যাদি ইস্যু ছেড়ে সঙ্ঘের পিছনে আদাজল খেয়ে কেন লেগেছে? কংগ্রেসের পরিবারতান্ত্রিক শাসন আর অপরিমিত দুর্নীতির রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রতিবাদ এই মধ্যপ্রদেশের মাটিতেই হয়েছিল। আর সেটা স্বয়ংসেবকদের হাতেই। ১৯২৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর এই রাজ্যের গোয়ালিয়রেই জন্মেছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী। কৃষ্ণবিহারী বাজপেয়ী আর কৃষ্ণাদেবীর ভারতরত্ন সুপুত্র স্বাধীন ভারতে সফলতম অকংগ্রেসী রাজনীতিবিদ। সঙ্ঘের এই প্রচারকই ভারতকে কংগ্রেসের দুঃশাসনের অচলায়তন থেকে মুক্ত করেছিলেন। কংগ্রেসের একদা মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন দিগ্বিজয় সিংহ। তাঁর মৌরসিপাট্টা স্বয়ংসেবক রাজনৈতিক কর্মী সমর্থকদের জন্য শেষ হয়েছে। মুক্ত হয়েছে মধ্যপ্রদেশ। গত ১৮ জুলাই, ২০১১ সালে তিনি আর এস এসকে বোমা তৈরির কারখানা বললেন। এই মিথ্যা অপপ্রচারের জন্য ২০১১ সালের ২৮ আগস্ট এলাহাবাদের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত দিগ্বিজয় সিংহকে ভর্ৎসনা করেন। কিন্তু এরা কুৎসা রটাতেই থাকেন। আর এই কুৎসা রটানোর কাজে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করতেন এক সাংবাদিক অমৃতা রাই। ২০১৪ সালে প্রকাশিত হয় যে, এই বর্ষীয়ান নেতা অমৃতার সঙ্গে প্রণয়ে আবদ্ধ। এরপর বিয়ে করলেন তাকে। দিগ্বিজয় তখন ৬৭ আর অমৃতা ৪৩। এই মতাদর্শের ক্ষমতালোভী নেতাদের কাছে আর এস এস প্রকৃত অর্থেই বড় বিপদ!

বিগত লোকসভা নির্বাচনে ১৬৫টি আসন পেয়েছিল বিজেপি। ভোটের হার ৪৪.৮৮ শতাংশ। সেবার কংগ্রেস বহুজন সমাজ পার্টি, সমাজবাদী পার্টি এবং গণ্ডোয়ানা গণতন্ত্র পার্টির সঙ্গে নির্বাচনী বোঝাপড়া করেছিল। পরে অবশ্য বিএসপি আর জোটে থাকেনি। তার জায়গায় এসেছে জয় আদিবাসী ক্ষুব্ধশক্তি নামে মাওবাদীদের ঘনিষ্ঠ একটি নতুন রাজনৈতিক শক্তি। দেশ বিরোধী সব শক্তিকে সঙ্গে নিয়েও এবার কংগ্রেস গতবারের থেকে ভালো ফল করতে পারবে না বুঝেই সঙ্ঘকে আক্রমণ করছে। তাই অতিবামপন্থী জাতপাতের প্রভাবিত জায়গাগুলিতে অহেতুক আগুন লাগানোর চেষ্টা হয়েছে। তবু চম্বল, বিন্দ্য, বাঘেলখণ্ড, দাতিয়া, ভিন্দু, মুরৈনা, শ্যোপুর, সবলগড়, আবাল দিমানী, রেওয়া, সতনা, সিধি বা মাণ্ডলাতে মানুষ নির্ভয়ে ভোট দেবে। মানুষ জাতপাত ভুলে এক হবে। ■

পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন
ক্ষমতা দখলের লোভ বনাম দেশ গড়ার স্বপ্ন

চন্দ্রভানু ঘোষাল

শতাব্দী প্রচীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীদের কাছে একটা বিষয় দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। সেটি হলো, তাদের কোনও নেতা নেই। কারণ দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাহুল গান্ধী সারাদিন শুধু ট্যুইট করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে গালিগালাজ করেন। এটা কোনও রাজনৈতিক নেতার কাজ হতেই পারে না। বস্তুত রাহুল গান্ধীর এহেন বালখিল্য সুলভ আচরণ যে জনমানসে তার ভাবমূর্তিটিকে আরও ম্লান করে দিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। মিডিয়া যতই তার হয়ে ঢাক পেটাক, বিরোধী নেতা যদি রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরির নামে সারাক্ষণ কূটকাচালিতে ব্যস্ত থাকেন তাহলে আর যাই হোক তাকে সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না। মানুষের এই নেতিবাচক মনোভাবের ফলও মিলেছে প্রত্যেকটি প্রাক-নির্বাচনী সমীক্ষায়। সর্বজ্ঞ মিডিয়া পাঁচ রাজ্যের আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেসকে প্রায় জিতিয়ে দিলেও, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর ধারেকাছে কেউ যে এই মুহূর্তে নেই, সেটা স্বীকার করে নিয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ছত্তিশগড়কে দিয়ে শুরু পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন পর্ব। নভেম্বরের শেষ দিকে এবং সারা ডিসেম্বর মাস জুড়ে ক্রমান্বয়ে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মিজোরাম এবং তেলেঙ্গানায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ইতিমধ্যেই ছত্তিশগড়ে দু' দফায় ভোট গ্রহণ পর্ব সম্পন্ন হয়েছে। মাওবাদী রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ভোট দিয়েছেন অসংখ্য মানুষ। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ভোট পড়েছে ৭০ শতাংশেরও বেশি। বলা বাহুল্য, কংগ্রেস নেতারা এটা আশা করেননি। এর আগে, ২০১৩ সালের নির্বাচনে মাওবাদী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে ভোট পড়েছিল মাত্র ১৫ শতাংশ। এবং অধিকাংশ আসনে জয়লাভ করেছিল কংগ্রেস। সেই কথা মাথায় রেখে, এবারে এক নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা- বেষ্টনীর মধ্যে ছত্তিশগড়কে মুড়ে ফেলেছিল কেন্দ্র। শুধু ভোটের জন্য মোতায়েন করা হয়েছিল লক্ষাধিক নিরাপত্তা কর্মীকে। এর ফলও

মিলেছে হাতেনাতে। ছত্তিশগড়ের মানুষ প্রমাণ করেছেন তারা গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট। এবং বুলেটের থেকে ব্যালটেই তাদের বেশি আস্থা। কিন্তু এর মধ্যেই একটা প্রশ্ন উঠেছে। এই বাড়তি ভোট কে পাবে? বিজেপি না কংগ্রেস? মূলত কংগ্রেসের অন্দরমহলেই প্রশ্নটা ঘোরাফেরা করছে। পশ্চিমবঙ্গে ভোট কম পড়লে তার সুবিধা পায় শাসক দল। কারণ এখানে রিগিং আছে, বুথ দখল আছে, ছাপ্পা ভোট আছে। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যে এসব নেই। যেখানে ভোট কম পড়লে ক্ষতি দু' পক্ষেরই হয়। আবার বেশি পড়লে লাভও হয় দু' পক্ষের। ছত্তিশগড়ে অবশ্য নিয়মটা এমন গতানুগতিক নয়। ২০১৩ সালের কথাই ধরা যাক। সেবার ভোট কম পড়েছিল মাওবাদীদের ভয়ে। যাঁরা ভোট দিতে পেরেছিলেন— কংগ্রেসকে ভোট দেবেন এই শর্তেই তাদের ভোট দিতে দেওয়া হয়েছিল। কারণ সেবার তলে তলে মাওবাদীদের সঙ্গেই জোট বেঁধেছিল কংগ্রেস। এবারও একটা বোঝাপড়া হয়েছিল। কিন্তু বাদ সাধলেন নরেন্দ্র মোদী। এমন এক অভূতপূর্ব নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলেন মাওবাদী জঙ্গিরা তেমনভাবে দাঁত ফোটাতে পারল না।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, ভোটের আগে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী রমণ সিংহ কিছুটা বেকায়দায় ছিলেন। মূলত প্রতিষ্ঠান বিরোধিতাই এর কারণ। ছত্তিশগড়ে একটানা পনেরো বছর ক্ষমতায় আছে বিজেপি। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ভোটের কয়েকমাস আগে ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজিত যোগীর কংগ্রেস ত্যাগ এবং নতুন দল গঠন বিজেপিকে আবার শক্ত জমির ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়। এবং অন্তর্দ্বন্দ্বে জীর্ণ কংগ্রেসের ভেতরের চেহারাটিও প্রকাশ্যে চলে আসে। এরপর বলতে হয় ছত্তিশগড়ের বাঙ্গালিদের কথা। সাতচল্লিশের দেশভাগ এবং একাত্তরের বাংলাদেশ- মুক্তিযুদ্ধের পর উদ্বাস্তু হয়ে আসা বাঙ্গালিদের একটা বেশ অংশ ছত্তিশগড়ে গিয়ে বসবাস শুরু করেছিলেন। এখন তারাই ছত্তিশগড়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ। মুখ্যমন্ত্রী রমণ সিংহ জমির পাট্টা বিতরণ করে ছত্তিশগড়ে তাদের স্থায়ী বসবাস একরকম নিশ্চিত করেছেন। বাঙ্গালি ভোটারদের ভোট এবার বিজেপির দিকেই যাবে। সুতরাং ছত্তিশগড়ে অ্যাডভান্টেজ বিজেপি।

মধ্যপ্রদেশেও বিজেপির পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। এই রাজ্যটি হিন্দু প্রধান। এখানকার মোট জনসংখ্যার মাত্র ১০ শতাংশ মুসলমান। সুতরাং হিন্দুত্ব এই রাজ্যের মানুষের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। সেই হিসেবে বলা যেতে পারে রামমন্দির নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায় এবারের ভোটে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। তাতে কংগ্রেসের ক্ষতি বই লাভ নেই। কারণ রামকে কাল্পনিক চরিত্র বানিয়ে উপেক্ষা এবং লাগাতার মুসলমান তোষণ কংগ্রেসকে হিন্দুত্ব বিরোধী দলে পরিণত করেছে। রাহুল গান্ধী যতই নিজেকে উপবীতধারী শৈব বলুন, মন্দিরে-মন্দিরে পুজো দিয়ে বেড়ান, তাতে যে চিঁড়ে ভিজবে না সেটা তিনিও জানেন। গুজরাটের নির্বাচনে তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। তবে বিজেপিকেও মনে রাখতে হবে এখন ভারতের মোট জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশের বয়েস চল্লিশের নীচে। তাদের মধ্যে একটা বড়ো অংশের রামজন্মভূমি আন্দোলন সম্বন্ধে কোনও ধারণা নেই। ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্য নির্মাণে রামের ভূমিকা এবং অবদান তাদের কাছে স্পষ্ট করে তোলা দরকার। রাম যে সাধারণ কোনও দেবতা নন, ভারতীয় জাতীয়তার প্রতীকপুরুষ, অখণ্ড ও সার্বভৌম ভারতের প্রতীক হিসেবেই তাঁর মন্দির নির্মাণ জরুরি--- এই বোধ ও অনুপ্রেরণায় যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব বিজেপিরই। বিজেপি যদি এই দায়িত্ব যথাযথ পালন করে থাকে তাহলে মধ্যপ্রদেশেও তাদের কোনও চিন্তা নেই।

সম্প্রতি টাইমস গ্রুপ একটি প্রাক-নির্বাচনী সমীক্ষা করেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে মধ্যপ্রদেশে বিজেপির সম্ভাব্য আসন সংখ্যা ১২২। কংগ্রেসের ৯৫। ব্যবধান নিশ্চয়ই কমতে বা বাড়তে পারে। সমীক্ষকেরা মন্তব্য করেছেন, মধ্যপ্রদেশের সাধারণ মানুষের কাছে শিবরাজ সিংহ চৌহানই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথম পছন্দ। কংগ্রেস এখনও কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন ঠিক করে

উঠতে পারেনি। দিগ্বিজয় সিংহ আছেন, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া আছেন। সঙ্গে আছে তাঁদের অবর্ণনীয় গোষ্ঠীকোন্দল। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা তৈরি করতে নাজেহাল হয়েছে রাজ্য নেতৃত্ব। এতদ্‌সত্ত্বেও, কংগ্রেস নেতারা যদি ইতিবাচক মনোভাব দেখাতে পারতেন তাহলেও একটা কথা ছিল। দশ বছরের ইউপিএ শাসনের নানাবিধ দুর্নীতি ঢাকতে তারা বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের কালিমালিপ্ত করার কাজে ব্যস্ত। যেসব মামলা বহুদিন আগেই আদালতে নিষ্পত্তি হয়ে গেছে, স্রেফ রাজনৈতিক স্বার্থে সেগুলো টেনে নামানো হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ ব্যাপম কাণ্ডের কথা বলা যেতে পারে। এমনকী গোধরাকাণ্ড নিয়েও জনস্বার্থে মামলা দায়ের করা হয়েছে। কংগ্রেস নেতারা ভালোই জানেন এইসব মামলার ফলাফল কী হতে পারে। কিন্তু যে ক'দিন মামলার শুনানি চলবে মিডিয়া একটা খোরাক পাবে। এবং মিডিয়াই তাদের জয়ের ভিত গড়ে দেবে--- এমনটাই কংগ্রেস নেতাদের ধারণা।

বলা বাহুল্য, এই ধারণা একই সঙ্গে অবাস্তব এবং অপরিণামদর্শী। গণতন্ত্রে নির্বাচন হয় কর্মসূচিকে ভিত্তি করে। নেতার ভাবমূর্তি এবং দক্ষতা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। সারা দেশের মতো মধ্যপ্রদেশেও কংগ্রেসের যে কে প্রকৃত নেতা অর্থাৎ জিতলে কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন বোঝা মুশকিল। প্রত্যেকেই ক্ষমতার রসভাণ্ডটির দখল নেবার জন্য মনে মনে মুখিয়ে রয়েছেন। দৈবাৎ যদি শিকে ছেঁড়ে সবাই একেবারে হামলে পড়বেন। এ ব্যাপারে দিগ্বিজয় সিংহ, কমলনাথ বা জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া কেউ কম যান না। অন্যদিকে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী একজনই— শিবরাজ সিংহ চৌহান। এই স্বচ্ছতা এবং সততা আজকের ভারতীয় গণতন্ত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এবার মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের সঙ্গে মায়াবতী এবং মুলায়মের কোনও বোঝাপড়া হয়নি। সুতরাং মধ্যপ্রদেশের বিপুল জনজাতি ভোটের খুব সামান্যই কংগ্রেসের কপালে জুটবে। সব মিলিয়ে বলা যেতেই পারে মধ্যপ্রদেশে বিজেপি এগিয়ে। তারা যদি একটানা চতুর্থবার মধ্যপ্রদেশে সরকার গঠন করে তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

রাজস্থান আর একটি ভোটমুখী রাজ্য। মিডিয়ার অঙ্কে সেখানে প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার হাওয়া প্রবল। প্রাক-নির্বাচনী সমীক্ষায় অনেকে ইতিমধ্যেই কংগ্রেসকে রাজস্থানে জিতিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অশোক গেহ্‌লট এবং শচীন পাইলটের সমীকরণে যে ফাটল দেখা দিয়েছে সেটি কেউ ধর্তব্যের মধ্যে রাখছেন না। দু'জনেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে জানিয়েছেন। অর্থাৎ জিতলে মুখ্যমন্ত্রিত্বের দাবিদারও হবেন। এবার রাজস্থানে কংগ্রেসের তথাকথিত উত্থানের প্রকৃত কারিগর শচীন পাইলট। রাজস্থানের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশের বয়েস পঁচিশের নীচে। এইসব অল্পবয়েসি ভোটাররা তরুণ শচীন পাইলটকে তাদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছেন বলে মিডিয়ায় ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে। তুলনায় অশোক গেহ্‌লট বয়েসে প্রবীণ এবং এ আই সি সি-তে তাঁর স্থান রাহুল গান্ধীর পরেই। সেই হিসেবে তাঁকে রাহুল গান্ধীর দূত বলা যেতে পারে। কিংবা একটু অন্য ভাবে বললে গান্ধী পরিবারের প্রতিনিধি। মুশকিলটা এখানেই। সারা দেশের মতো রাজস্থানেও সাধারণ কংগ্রেস কর্মীরা এখন গান্ধী পরিবারের হুকুম মানতে আর ততটা আগ্রহী নন। কারণ গত কয়েক বছরে পরিবারটির নেতৃত্ব বারবার বিভিন্ন নির্বাচনে মুখ থুবড়ে পড়েছে। এবং রাহুল গান্ধীর রাজনীতি নরেন্দ্র মোদীর নিন্দামন্দ-নির্ভর এক হাস্যকর সার্কাসে পরিণত হয়েছে। ২০১৪ সালের নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হবার পর থেকে রাহুল গান্ধী একের পর এক মিথ্যে অভিযোগ করে গেছেন। লাল ডায়েরি থেকে সজ্ঞ— সেখান থেকে রাফাল, তার ইস্যুর অভাব হয়নি। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই হয় তিনি আদালতে ভর্ৎসিত হয়েছেন নয়তো সাধারণ মানুষ ভোটের মাধ্যমে তাকে উচিত শিক্ষা দিয়েছেন।

এই অবস্থায় কংগ্রেসের ফোলানো বেলুন রাজস্থানের আকাশে কতক্ষণ উড়বে বলা মুশকিল। এইটুকু বলা চলে রাজস্থানেও যদি তরী ডোবে তাহলে অন্তত আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না।

তবে হ্যাঁ, রাজস্থানের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজ্যে সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের কিছু অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজস্থানের একাধিক জনসভায় এইসব অভিযোগের নিরসনে বিজেপি কী ভাবছে তার একটা রূপরেখা ঠিক করে দিয়েছেন। নরেন্দ্র মোদীকে দলমত-নির্বিশেষে দেশের সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করেন। তাঁর কথার একটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব আছে। যে প্রভাব আমরা কিছুদিন আগে গুজরাটে দেখেছি, কর্ণাটকে দেখেছি। সেই চোখধাঁধানো মোদী-ম্যাজিক আমরা রাজস্থানেও দেখতে পারি। সুতরাং রাজস্থানে কংগ্রেস জিতে গেছে— একথা বলার সময় এখনও আসেনি। বিজেপির সুযোগ আছে। এমনিতেই রাজস্থানে প্রত্যেক পাঁচ বছর অন্তর সরকার পাল্টায়। কংগ্রেসের 'অবশ্যম্ভাবী' জেতার অঙ্ক সম্ভবত এই প্রবণতার কথা মাথায় রেখে তৈরি হয়েছে। তবে অঙ্ক যাই হোক, বিজেপির স্বচ্ছতা, সততা, পেশাদারিত্ব এবং সর্বোপরি নরেন্দ্র মোদীর গত চার বছরের ভাবমূর্তি সব উল্টে দিতে পারে। ফিরিয়ে আনতে পারে বিজেপিকে।

জনজাতি-অধ্যুষিত মিজোরামে নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করে চার্চ। সুতরাং কংগ্রেস এগিয়ে। কারণ ছত্তিশগড়ে মাওবাদী, মিজোরামে খ্রিস্টান এবং জম্মু-কাশ্মীরে ইসলামিক জিহাদি গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে কংগ্রেসের আঁতাত কারও অজানা নয়। অন্যদিকে তেলেঙ্গানায় বিজেপি এবার ১১৯টি আসনেই লড়বে। সেখানে তেলুগু দেশমের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধায় কংগ্রেস ক্ষতিগ্রস্তই হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তেলুগু দেশম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এন.টি. রামা রাও। ভোটের জন্য সেই কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা ভালো ভাবে নিচ্ছেন না তেলুগুভাষী মানুষজন। সুতরাং বিজেপির অবস্থা মোটেই খারাপ নয়। এখন ক'টি রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসে সেটাই দেখার। আর রাহুল গান্ধী নির্বাচনের ফলাফল থেকে কোনও শিক্ষা নেন কি না সেটাও দেখতে চান দেশের মানুষ। ■

নিত্যানন্দ পার্ষদ পুরন্দর পণ্ডিত

(শ্রীপাট খড়দহ থেকে শ্রীপাট পাহাড়পুর)

তমালকৃষ্ণ মহান্ত

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, অবধূত নিত্যানন্দ এবং প্রবীণ বৈষ্ণব অদ্বৈত আচার্যের সমবেত প্রচেষ্টার ফলে বঙ্গদেশে ভক্তি আন্দোলনে এক জনজোয়ার দেখা দেয়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ এই গণ-আন্দোলনে শামিল হয়। তবে আন্দোলনের এই পথটি কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। তৎকালীন মুসলমান শাসক কাজির সঙ্গে বৈষ্ণব বিরোধীরা একত্রিত হয়ে রাজপথে হরিনাম সংকীর্তন বন্ধ করার চেষ্টা করে। শাসক কাজি ঢোল পিটিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। চৈতন্য মহাপ্রভু তার অনুগামীদের নিয়ে হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে কাজির নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তাকে

পুরন্দর পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত রাধামোহন জিউ বিগ্রহ।

এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে বাধ্য করেন। এই ঐতিহাসিক কাজি দলনের নেতৃত্বে ছিলেন নিত্যানন্দ। ড. সুকুমার সেন এই ঘটনাটিকে বাংলাদেশে রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রথম গণ- আন্দোলন বলে অভিহিত করেছেন। সমাজে সব শ্রেণীর মানুষের এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থ মর্যাদা দিয়ে লিখেছেন— 'বাংলায় একদিন বৈষ্ণব ভাবের প্রাবল্যে ধর্মসাধনায় বা ধর্মরসভোগে একটি ডিমোক্র্যাসির যুগ এল'।

নিতানন্দ মহাপ্রভুর একান্ত পার্ষদ পুরন্দর পণ্ডিত বাংলাদেশে পঞ্চদশ শতকে এই ভক্তি আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। সুন্দরানন্দ ঠাকুর পরিবারভুক্ত পুরন্দর পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন হলদা মহেশপুর গ্রামে। দ্বাদশ গোপালের অন্যতম সুন্দরানন্দ ঠাকুরের জন্মস্থানও সেই গ্রামে। পরবর্তীকালে খড়দহে মন্দির নির্মাণ করে তিনি সেখানে বাস করেন। অপূর্ব আগার পুরন্দরের দেবালয় স্থান। আড়িয়াদহের গদাধর দাসের গৃহে নাম সংকীর্তন করতে করতে নিত্যানন্দ প্রভু অবিবাহিত অবস্থায় প্রথমবার খড়দহে পুরুন্দরের দেবালয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

রথযাত্রা উপলক্ষ্যে গৌরভক্তের দল প্রতি বছর পুরীধামে আসতেন। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলন। একদিন নিভৃতে মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে ডেকে বলেন, গৌড়দেশে বা রাঢ়বঙ্গে যারা পতিত, নীচ, মূর্খ দীন-দুঃখী এবং সংসারবদ্ধজীব তাদের উদ্ধার করে সন্ন্যাসীর জীবন সার্থক করতে হবে, তাছাড়া সন্ন্যাসীর জীবনের কোনও মূল্য নেই। মানবতাবাদী সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্য বুঝতে অবধূত নিত্যানন্দের দেরি হয়নি। প্রভুর নির্দেশ পাওয়া মাত্র নিত্যানন্দ তাঁর পরিকর ও ভক্তদের নিয়ে গৌড়দেশের উদ্দেশে যাত্রা করেন। নিত্যানন্দের সঙ্গে ছিলেন রামদাস, গদাধর দাস, রঘুনাথ, বৈদ্য ওঝা, কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত-সহ অনেক গৌরভক্ত। চলার পথেই নিত্যানন্দ সব পার্ষদকে প্রেমময় করে তুললেন। সকলেরই আত্মবিস্মৃতি ঘটল। রাম দাসের মধ্যে দেখা দিল শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ। গদাধরের রাধিকার ভাব, কৃষ্ণদাস ও পরমেশ্বর দাস দু'জনে গোপাল ভাবে হৈ-চৈ করতে লাগলেন। পুরন্দর হঠাৎ লাফিয়ে গাছে চড়ে বসলেন, আরও বললেন, 'আমি হলাম অঙ্গদ'।

পুরন্দর পণ্ডিত গাছেতে গিয়া চড়ে।
আমি যে অঙ্গদ বলি লাফ দিয় পড়ে।।
(চৈ.ভা. অন্ত খণ্ড পঞ্চম অধ্যায়)

আত্মবিস্মৃত সাধক পুরন্দরের রামলীলার অঙ্গদ ভাবটি তখন প্রকট হয়ে পড়ে। সকলেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পথের দুঃখ-কষ্ট সবকিছুই ভুলে পথ চলার আনন্দে বিভোর হয়ে আছেন। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে সপার্ষদ নিত্যানন্দ পানিহাটি গ্রামে রাঘব পণ্ডিতের বাড়িতে কিছুদিন অবস্থান করে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিকে প্রেমভক্তি রসে মাতোয়ারা করে তোলেন।

আইলেন গঙ্গাতীরে পানিহাটি গ্রাম।।
রাঘব পণ্ডিতের গৃহে সর্বাদ্যে আসিয়া।
রহিলেন সকল পার্ষদগণ লইয়া।।
(চৈ.ভা.)

ধর্মবিমুখ পাষণ্ডী প্রধান রাঢ়দেশে পতিত-অধম-অস্পৃশ্যদের উদ্ধারের জন্য গৌরভক্তের দল বিভিন্ন গ্রামে বিচরণ করে প্রেমভক্তি প্রচার করেন। শ্রীচৈতন্য তার ভক্তদের নিয়ে মূলত নগরকেন্দ্রিক স্থানগুলিতে বিচরণ করেছেন। নিত্যানন্দ কিন্তু ধর্মপ্রচারের জন্য মূলত গ্রামগুলিতেই বিচরণ করেছেন। বৈষ্ণব সাহিত্য ও ধর্মের প্রখ্যাত গবেষক ড. বিমানবিহারী মজুমদার তার 'চৈতন্য চরিতের উপাদান' গ্রন্থে লিখেছেন, শ্রীচৈতন্যের জীবদ্দশায় রাঢ়দেশে বৈষ্ণব ধর্মের কোনও প্রচার ছিল না। নিত্যানন্দের জন্মস্থান এই রাঢ়দেশে বীরভূমের একচক্রা

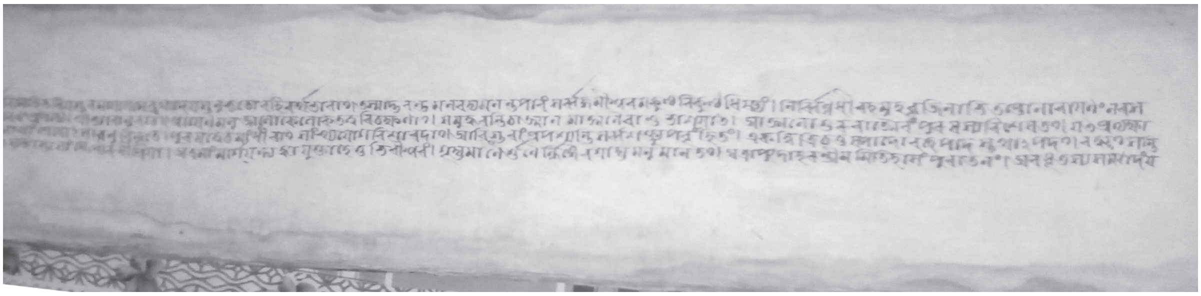

পাহাড়পুর মহন্ত ঠাকুরবাড়িতে সংরক্ষিত পুঁথি।

গ্রাম। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর একান্ত ভক্ত পুরন্দর এই রাঢ়দেশে থেকেই মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচার করুক।

পানিহাটির ঐতিহাসিক চিড়া মহোৎসব : নিত্যানন্দ প্রভুর মধ্যে ধর্মীয় কঠোরতা, আচার সংস্কার বিশেষ স্থান পায়নি। তৎকালীন বর্ণাশ্রম অনুযায়ী জাতিভেদ প্রথার তিনি ঘোরতর বিরোধী। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ।

পানিহাটির ঐতিহাসিক চিঁড়া মহোৎসবে ছত্রিশ জাতকে এক পংক্তিতে বসিয়ে গণভোজন করিয়ে এক অভিনব সামাজিক সংহতি গড়ে তুলেছিলেন। এই ধর্মীয় জাগরণ আধুনিককালের তথাকথিত সাম্যবাদের চেতনাকেও বিস্মিত করে। নিত্যানন্দের প্রায় সমস্ত পার্ষদ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এই ভাগ্যবান ভক্তদের তালিকায় আছেন— রামদাস, সুন্দরানন্দ, গদাধর দাস, মুরারি গুপ্ত, চৈতন্য দাস পুরন্দর পণ্ডিত, ধনঞ্জয় পণ্ডিত, উদ্ধারণ দত্ত, কৃষ্ণদাস, জগদীশ পণ্ডিত প্রমুখ। নিত্যানন্দ ধ্যানযোগে চৈতন্য মহাপ্রভুকে নীলাচল থেকে এনে একে অপরকে চিঁড়া ভোজন করিয়েছিলেন। ভাগ্যবান বৈষ্ণব সাধকেরা এই অলৌকিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন। নিত্যানন্দ বৈষ্ণব অনুষ্ঠানগুলিকে নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ভক্তিভাবকে তিনি এক আন্দোলনে পরিণত করেছেন। পুরন্দর ছিলেন তাঁর আন্দোলনের সমর্থক ও অন্যতম প্রধান সহযোগী।

পুরন্দরের স্বরূপ : কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে পুরন্দরের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন—

নিত্যানন্দপ্রিয় অতি পণ্ডিত পুরন্দর।
প্রেমার্ণব মধ্যে ফিরে যৈছন মন্দর।। (চৈ.ভা. আদি ১১/১৮)

ড. রাধাবিনোদ নাথ উক্ত পংক্তি দুটির প্রসঙ্গে পুরন্দরের সাধনার স্বরূপটিকে সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন— ''মন্দর পর্বত সমুদ্র মধ্যে ঘূর্ণিত হওয়া যখন যেদিকে ফিরিত, সর্বদাই চতুর্দিকে কেবল সমুদ্রই দেখিত, তদ্রূপ পুরন্দর পণ্ডিত যখন যেদিকে দৃষ্টিপাত করিতেন কিংবা যখন তাহা শুনিতেন বা করিতেন তৎ সমস্তই তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমের উদ্দীপন স্বরূপ হইত। মূলত তিনি সর্বদাই প্রেমসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন''। (চৈতন্য চরিতামৃত ১ম খণ্ড ৬৩৫ পৃ.)

নরহরি চক্রবর্তী 'ভক্তি রত্নাকর' গ্রন্থে পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়ে নিত্যানন্দের সপার্ষদ হরিনাম সংকীর্তনের একটি চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন—

খড়দহে প্রভু পদ্মাবতী তনয়।
নিরন্তর সংকীর্তনে মত্ত অতিশয়।।
পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয় যথা।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম প্রকাশিল তথা।। (ভক্তিরত্নাকর ৮।১৬৫)

খড়দহে আসি প্রভু নিজগণ সঞে।
পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়ে রহে।।
প্রভু নিত্যানন্দ পুরন্দর পণ্ডিতেরে।
ডুবাইলেন সংকীর্তন সুখের সাগরে।।
শ্রীচৈতন্যদাস মুরারি পণ্ডিত যত।
সবেই হইল মত্ত সংকীর্তনে উনমত।।
খড়দহে নিত্যানন্দ নাচিয়া নাচিয়া।
বিলায় দুর্লভধন যাচিয়া যাচিয়া।। (ভক্তিরত্নাকর)

খড়দহে নিত্যানন্দের অবস্থান : খড়দহে নিত্যানন্দ প্রভু পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়ে নাম সংকীর্তনে এতই পরিতৃপ্ত হন যে সেখানেই তিনি একটি মন্দির স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নিত্যানন্দের এই শুভ ইচ্ছা পূরণে অগ্রণী ভূমিকা নিলেন পুরন্দর পণ্ডিত। রবীন্দ্র কুমার রাহা তার 'বৈষ্ণব জগতের মাধুকরী' গ্রন্থে এ বিষয়ে লিখেছেন— ''খড়দহে পুরন্দর পণ্ডিতের গৃহে অবস্থান কালে নিত্যানন্দ প্রভু ভাবে প্রকারে এই খড়দহে শ্রীপাঠ স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করে। একেই পুরন্দর পণ্ডিত নিত্যানন্দ প্রভুর একান্ত একনিষ্ঠ ভক্ত তদুপরি এই মনোভাব জ্ঞাত হইবামাত্র তিনি সানন্দে সব ব্যবস্থাদি করিতে লাগিলেন এবং পরে সপ্তগ্রামের বণিক উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের সহায়তায় এই শ্রীপাট খড়দহে স্থাপিত হয়। ভাগ্যবান পুরন্দরের আনন্দ আর ধরে না। কারণ তিনি অবধূত নিত্যানন্দকে স্থায়ীভাবে নিজের কাছে প্রাপ্ত হইলেন।''

খড়দহ নিবাসী মোহিনী মোহন মুখোপাধ্যায় 'প্রভু নিত্যানন্দ' গ্রন্থে অন্য মত প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন— ''শান্তিপুর থেকে নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্তের আলয়ে কিছুদিন থাকার পর সস্ত্রীক খড়দহে আসেন। খড়দহে পুরন্দর পণ্ডিতের মনোরম দেবালয়ে আসেন। পুরন্দর পণ্ডিত নিজ দেবালয়ে নাম সংকীর্তন করতে থাকেন। পুরন্দর পণ্ডিতের প্রাণাধিক শ্রীনিত্যানন্দ সস্ত্রীক আজ স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চাইছেন। পুরন্দর পণ্ডিত নিজেকে ধন্য মনে করলেন তিনি তাঁর প্রভুকে খড়দহে বিশাল জায়গাসহ দেবালয় স্থানাদি, অর্পণ করে নিজে পাহাড়পুরে চলে যান।''

পুরন্দর পণ্ডিত যে অঙ্গদ সুমতি।
নিত্যানন্দ শাখা পাহাড়পুরেতে বসতি।।
খড়দহ গ্রামে যাঁহার জন্মস্থান।
তাঁর গৃহ নিত্যানন্দ প্রভু অবস্থান।।

মহাপাট পাহাড়পুর : পুরন্দর পণ্ডিত খড়দহ থেকে রাঢ় বঙ্গের

একটি প্রাচীন জনপদ পাহাড়পুরে আসেন। পাহাড়পুরে তিনি স্থাপন করেন শ্রীশ্রী রাধামোহন জিউ মন্দির। পাহাড়পুর বীরভূম জেলায় আমোদপুর রেলজংশনের দক্ষিণে ৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বক্রেশ্বর নদীর তীরবর্তী এই গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনোরম। বিভিন্ন বৃত্তিজীবী সম্প্রদায় এবং নানান জাতের বসবাস। হরিদাস দাস কৃত 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন' গ্রন্থে পুরন্দরের পাহাড়পুর শ্রীপাটের কথা আছে। নবদ্বীপ চন্দ্র গোস্বামীর 'বৈষ্ণব আচার দর্পণ' এবং কবি কর্ণপুরের 'গৌড়গণদ্দেশদীপিকা গ্রন্থেও পুরন্দর পণ্ডিতের পাহাড়পুর বাসের কথা আছে। পাহাড়পুরে শ্রীশ্রীরাধামোহন জিউ মন্দিরে আজও নিত্যসেবা, অন্নভোগ, ও বৈষ্ণবীয় উৎসব অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলী এইসব উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান করে গ্রামটিকে আনন্দমুখর করে তোলেন। গ্রামের কেন্দ্রভাগে রয়েছে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জিউ মন্দির। অদ্বৈত প্রভুর মন্ত্রশিষ্য ঈষাণনাগর ঠাকুরের পরবর্তী প্রজন্ম রামকানাই ঠাকুর এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এখানকার রাস উৎসব স্থানীয় গ্রামগুলিকে আনন্দমুখর করে তোলে। পাহাড়পুরের দু'টি শ্রীপাট পাহাড়পুরকে মহাপাটে পরিণত করেছে।

পুরন্দর পণ্ডিতের বন্দনায় বৈষ্ণব কবিগণ : পুরন্দরে পণ্ডিতের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্ন বৈষ্ণব কবি। চৈতন্যলীলার আদি কবি বৃন্দাবন দাসের বৈষ্ণব বন্দনায় আছে—

বন্দো মূর্তি মনোহর ঠাকুর পুরন্দর
যেই সেই অঙ্গদ ঠাকুর।
এক বিপ্র লয়ে তাঁরে অতিথি করিল ঘরে
গোষ্ঠী সহ দেখিল লাঙ্গুল।।

শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর বৈষ্ণব বন্দনায় পুরন্দর পণ্ডিত প্রসঙ্গে তার স্বরূপটি তুলে ধরেছেন—

বন্দে পুরন্দরং সাক্ষাদঙ্গ দেন সমংত্বিহ।
যল্লাঙ্গুলং সংদদর্শ গৃহে কশ্চিদ্বিজোত্তমঃ।।

দেবীকীনন্দন উক্ত পংক্তি দুটির অনুসরণে লিখেছেন—

পুরন্দর পণ্ডিত বন্দো অঙ্গদ বিক্রমে
সপরিবারে লাঙ্গুল যাঁর দেখিলা ব্রাহ্মণে।।

কাটোয়ার মহোৎসব বর্ণনা উপলক্ষে নরহরি চক্রবর্তী ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে যে চৌষট্টি জন মহান্তের নাম উল্লেখ করেছে সেখানে তিনি পুরন্দর পণ্ডিতকে ১৪ সংখ্যক মহান্তের পর্যায়ে স্থান দিয়েছেন। রাঢ় বঙ্গে এই চৌষট্টি মহান্তের ভোগ বৈষ্ণব সমাজে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়।

পুরন্দরের জন্মসাল সঠিক ভাবে জানা যায় না। তাঁর জন্মস্থান পাহাড়পুর মহান্তঠাকুরের বাড়ি থেকে বলা হয় হলদা মহেশপুর (২৪ পরগনা)। স্থানটি খড়দহ থেকে বেশি দূর নয়। কোনও কোনও বৈষ্ণব পণ্ডিতের মতে তাঁর জন্মস্থান খড়দহ। পুরন্দর পণ্ডিতের তিরোধান সালটি জানা যায় না। তবে তিথিটা হচ্ছে দোলপূর্ণিমার ১৫ দিন পরে কৃষ্ণপক্ষ। এই তিথিতে তাঁর স্মরণে পাহাড়পুরে অনুষ্ঠিত হয় কূলমহোৎসব। এই তিথিটিকেই তাঁর তিরোধান তিথি হিসাবে ভক্তশিষ্য মণ্ডলী তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাধামোহন জিউ মন্দিরে আজও উদযাপিত করে থাকেন। ■

কার্তিক সংক্রান্তির ব্রত

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

ইতু/ইবতি এবং চুঙী ব্রত : ইতু পুজো হলো সূর্যপূজা। সূর্যবাচক 'মিত্র' শব্দ থেকে ইতু বা ইথু শব্দের উৎপত্তি। কার্তিক সংক্রান্তিতে ইতুপুজোর শুরু আর অঘ্রাণ সংক্রান্তিতে শেষ। কুমারী ও বিবাহিতা নারীরা এই ব্রতের পালিকা। সাংসারিক কল্যাণ, ধন-সম্পদ লাভ, কুমারীদের পতিলাভ এই ব্রতের উদ্দেশ্য।

মানভূম অঞ্চলে 'ইবতি'-র প্রতিষ্ঠা হয় মাটির হাঁড়ি চকখড়িতে অনুরঞ্জিত করে এবং তাতে নানান গাছগাছালি দিয়ে। অন্যান্য অঞ্চলে ইতু-ঘট পাতার সময় মাটির সরা ব্যবহৃত হয়; তার উপর ছড়ানো হয় পাঁচ কড়াই (সাধারণ ভাবে চার রকমের ডালশস্য— ছোলা, মটর, মাস কলাই, মুগ এবং যব)।

পূর্ববঙ্গে পালিত হয় চুঙীর ব্রত, কার্তিক সংক্রান্তিতে তার শুরু, অঘ্রাণ মাসের প্রতি রবিবার পালন এবং অঘ্রাণ সংক্রান্তিতে সমাপ্তি। চুঙীর ব্রতে নলগাছের চোঙার মধ্যে একুশ গাছি দূর্বা ও একুশটি আলো-চাল ভরে তা দুধে স্নান করিয়ে সূর্যকে নিবেদন করা হয়। শোনা হয় ব্রতকথা।

মুঠ উৎসব : ''মুঠ' উৎসব বা 'মুঠ লক্ষ্মী'র পুজো অঞ্চল বিশেষে তা পয়লা অঘ্রাণও অনুষ্ঠিত হয়। সকালে উঠে স্নান করে, শাঁখ বাজিয়ে গঙ্গাজল, সিঁদুর, তুলো নিয়ে যাওয়া হয় ধানক্ষেতে। ক্ষেতের ঈশান কোণের আড়াই ঝাড় ধানগাছের ওপর গঙ্গাজল ছিটিয়ে, সিঁদুর দিয়ে ওই আড়াই ঝাড় ধান কেটে ক্ষেতের কাটা ধানগাছের গোড়ায় সিঁদুর মাখা তুলো রেখে, কাটা আড়াই ঝাড় ধানগাছ কলাবৌয়ের মতো পাট, রেশম বা চেলি কাপড়ে মুড়ে শাঁখ বাজিয়ে আনা হয় বাড়িতে" (নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য, ১৩৭৪)। এই মুঠ উৎসবে উঠোনে দেওয়া হয় আলপনা, তার উপর রাখা হয় আলপনা আঁকা পিঁড়ি। 'মুঠ ধান' বহনকারী ব্যক্তি এসে দাঁড়ায় সেই পিঁড়িতে। ঘটা করে ধুইয়ে দেওয়া হয় তার পা। এই ধান পুজো করে তুলে রাখা হয়; পরে পৌষমাসে লক্ষ্মীপুজোয় কাজে লাগে— তার খড় রাখা হয় লক্ষ্মীর ঝাঁপি, ধানের গোলা, চালের হাঁড়িতে।

৪. আকাশপ্রদীপ জ্বালানোর শেষ দিন : পূর্বপুরুষ কিংবা লক্ষ্মী-নারায়ণের উদ্দেশে তিলতেল বা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালানো হয় স্তম্ভের মাথায়, বাড়ির ছাদ বা টালির চালে কিংবা তুলসী তলায়। আজকাল মোমবাতি বা বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানোর রেওয়াজ হয়েছে। কার্তিক সংক্রান্তিতেই আকাশপ্রদীপ জ্বালানোর সমাপ্তি। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

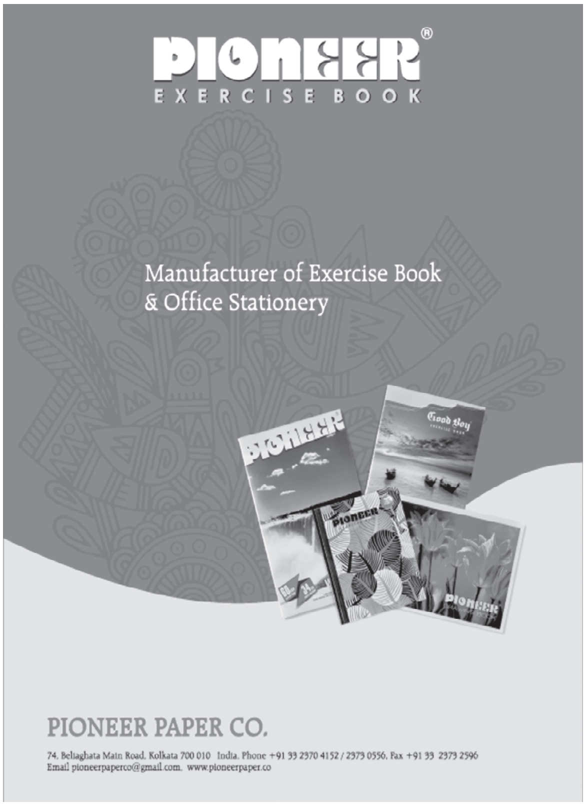

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

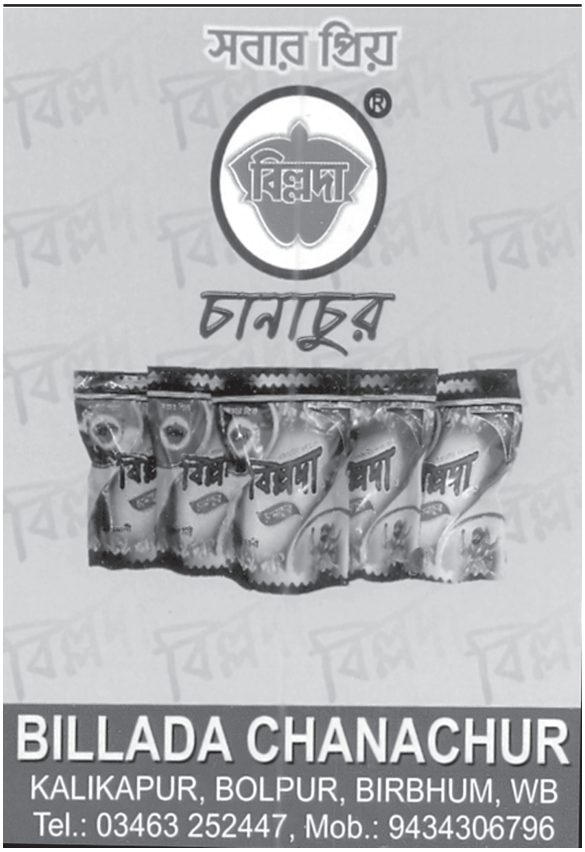

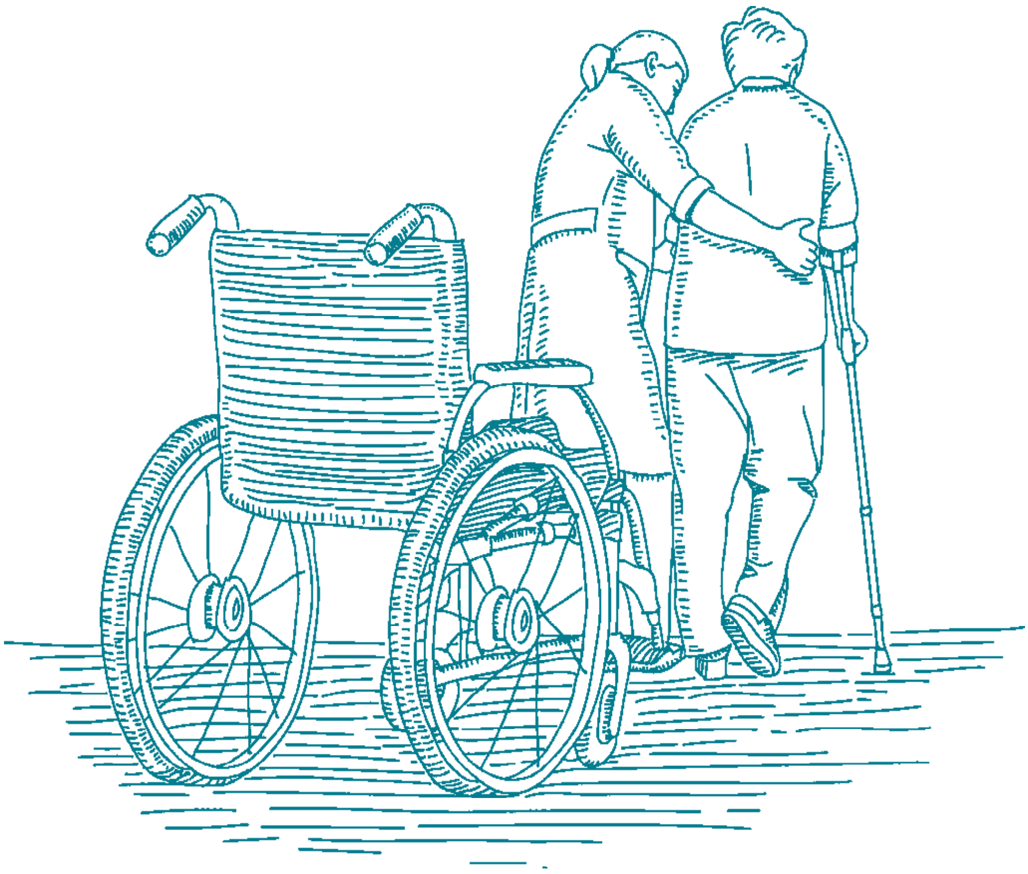

আঁধার পেরিয়ে

রূপশ্রী দত্ত

বাসস্টপ থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করল রিনি। সেই সকাল ছ'টায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। ফিজিওথেরাপির কাজটা তার খুবই প্রিয়। বি.এ. পাশ করার পর বন্ধুরা যখন বি.এড, স্কুল সার্ভিসের পরীক্ষা দিতে ব্যস্ত, রিনি তখন ঢুকে পড়েছিল ফিজিওথেরাপির কোর্সে। শৈশবে সে দেখেছিল ঠাকুরমা বাতের ব্যথায় কাতরাচ্ছে। তাই, পরে যখন বিজ্ঞানসম্মতভাবে বাতের চিকিৎসার ব্যাপক প্রচলন হলো, রিনি সিদ্ধান্ত নিল এটাই তার পেশা হবে। সে যোগ দিয়েছিল মণীশ রায়ের প্রতিষ্ঠানে। তিনি ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় ব্যায়ামগুলি রিনির মতো আরও অনেকের হাতে ছেড়ে দেন।

সকালবেলা পক্বকেশ, দন্তহীন, অশীতিপর এক বিপত্নীক বৃদ্ধের বাড়ি তাঁকে যেতে হয়। তারপর ছুটতে হয় উত্তর কলকাতারই আর এক বাড়িতে। এই কেসটা স্যার তাকে নতুন দিয়েছেন। বহুতল বাড়ির একটা ফ্ল্যাটে রিনি ঢোকে। রোগিনী বাঙ্গালি প্রৌঢ়া। পরনে টাঙ্গাইল শাড়ি। মোটামুটি সুশ্রী বলা যায়। ওকে নিমেষে আপন করে নিলেন। প্রয়োজনীয় ব্যায়ামগুলো সঠিকভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দিয়ে করিয়ে নেওয়াই ফিজিওথেরাপিস্টের কাজ। এই জন্য মাঝেমাঝে তাকে কিছুটা রূঢ়ভাষীও হতে হয়; কখনও আদেশের ভঙ্গি করতে হয়। কখনও বা অধিকতর পঙ্গু হয়ে যাবার ভয় দেখিয়ে কার্যোদ্ধার করতে হয়। তাই রিনি সব বাড়িতেই প্রয়োজনীয় গাম্ভীর্য বজায় রাখে। কাজের জায়গায় ফরম্যাল থাকাটা খুব জরুরি বলেই সে মনে করে। বহুতল ফ্ল্যাটের এই প্রৌঢ়া মহিলা কিঞ্চিৎ মেদবহুল। হাঁটুর ব্যায়াম, পায়ের ব্যায়াম করে অল্পেই হাঁপিয়ে ওঠেন। রিনি ব্যাগ হাতে নিয়ে বলে— 'দরকার হলে, শিরদাঁড়ার ব্যথায় আপনাকে আলট্রাসোনোও দিতে পারি। প্রাণায়াম দেব কিছুদিন পরে।' উঠে দাঁড়িয়ে রিনি বলে— 'এই যা। জলের বোতল আনতে ভুলে গেছি।' ভদ্রমহিলা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গিয়ে প্লেটে দুটো মিষ্টি আর জল আনলেন। রিনি বিব্রত হয়।

বাড়ি ফেরে রিনি। বাবা অফিসে। মা খাবার নিয়ে বসে আছেন। 'দিন দিন তোর চেহারাটা যে বড্ড খারাপ হয়ে যাচ্ছে রিন্টু।' 'ছাড়ো তো। কোথায় আবার খারাপ দেখলে?' 'নারে। মায়ের চোখে ঠিকই ধরা পড়ে। নাওয়া-খাওয়ার ঠিক নেই। সারাদিন খালি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ব্যায়াম শেখানো। অল্প খেটেই যা পেতিস, তাতেই তো চলত।'

'ও তুমি বুঝবে না মা। কাজের নেশা একবার এসে গেলে তা থেকে বেরোন মুশকিল।'

রিনির মনে হয়, বিপত্নীক বৃদ্ধের পুত্র পুত্রবধূই তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাঁরা আর বেশিদিন ওকে রাখতে চায় না। অতএব, এ চাকরি বেশিদিন নয়। কিন্তু টাকার যে বড় দরকার। বাবার বয়স হয়েছে। রিটায়ারমেন্টের পর খুব বেশি সঞ্চয়ও নেই। দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। ওরা

আমেদাবাদে থাকে। আসা যাওয়া কম, যোগাযোগ কম। রিনির মনে হয়, ওরা কেমন যেন নিরাসক্ত হয়ে গেছে।

এই তো সেদিন— বছর দুয়েক আগে একটা কেস সে হাতে পেয়েছিল। পঁচিশ বছরের মেয়ে পড়ে গিয়ে সাংঘাতিক স্পন্ডিলোসিস, আর্থারাইটিসের কবলে পড়েছিল। রিনি তাকে অসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায়ে সারিয়ে তুলেছিল। কে জানত, সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে তার নিজের জীবনেও।

অন্যমনস্ক হয়ে একদিন সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে রিনি পা পিছলে পড়ে গেল। বাবা, মা ক্ষোভে-দুঃখে দিশাহারা— 'কে তোকে বলেছিল, এমন করে জীবনপণ করে সংসারের ঘানি টানতে? আমাদের কি দুমুঠো জুটত না?' —মা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন। রিনি মায়ের গায়ে সান্ত্বনার হাত রেখে বলে— 'দুর্ঘটনা কি চাকরি না করলে ঘটত না মা?' দেখতে আসেন ব্যায়ামগুরু মণীশ রায়। আর্থারাইটিসে কাবু রিনিকে দেখে বললেন— 'এ কী হলো বলতো মা? যে রোগ তুমি ঘরে ঘরে গিয়ে সারাতে আজ তোমারই সেই রোগ ধরল।

মণীশ রায় চলে যাবার পর ঘরে ঢুকেছিল মণিদীপ। রিনি বলে— 'বিয়ের পরে চাকরি করা নিয়ে তোমার মনে দ্বিধা ছিল। দেখ, নিজের থেকেই কেস্‌টা তোমার ফরে গেল।' মণিদীপ বলে, 'তুমি একথা বলতে পারলে রিনি? বিয়ের পর এই পরিশ্রমসাধ্য চাকরি নিয়ে আমার মনে হয়তো দ্বিধা ছিল, তাই বলে তোমার এতবড় সর্বনাশ চাইব?' রিনি কেঁদে ফেলে— 'অবশ্য আর তো সে প্রশ্ন উঠছে না। আমার মতো একজন প্রতিবন্ধী মেয়েকে তোমার মতো সুপাত্র বিয়ে করবে কেন?' 'মিথ্যে অভিমানে, তুমি যে কী বলে চলেছ, নিজেই জান না। লোকের যত ব্যাধি নীলকণ্ঠের মতো ধারণ করেছ।'

'উঁহু। ব্যাকরণে ভুল। হবে নীলকণ্ঠী।' হঠাৎ রিনির কণ্ঠে লঘু পরিহাস রসিকতা। মুখের মেঘ কেটে গিয়ে স্মিত হাসির সূর্যালোক। মণিদীপ বলল— 'সঠিক চিকিৎসা করিয়ে তোমাকে আমি সুস্থ করে তুলব। এ বিয়েতে আমার তো বটেই, আমার বাবা-মায়েরও কোনও আপত্তি নেই। আর সুস্থ হয়ে অপরকে সুস্থ করার ব্রত যদি তুমি আবার গ্রহণ কর, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই।' অনেক আঁধার পেরিয়ে আলোকবর্তিকার সুস্পষ্ট নিশানা যেন এবার রিনির চোখে ধরা দিয়েছে। ■

গল্প

গন্ধ

রঞ্জিতকুমার ভরদ্বাজ

...মহাসপ্তমীর সন্ধ্যা। বাড়ির ভিতরের উঠানে ইজি চেয়ারে বসে আকাশে সপ্তমীর চাঁদের দিকে অলস দৃষ্টি মেলে আছেন অনুপম। হাল্কা মেঘের আনাগোনায় মাঝে মাঝে জ্যোৎস্না কিছু ম্লান হলেও চারিপাশের টবের গাছ, অল্প ঘাসজমি, টিউবওয়েল সবই সে আলোয় উজ্জ্বল। অদূরে পুজো-প্যান্ডেল থেকে ভেসে আসছে গান। পুরোনো দিনের একটা গান তাঁর মনে সঞ্চার করল মৃদু বিষণ্ণতা, জগন্ময় মিত্রের, তুমি আজ কতো দূরে... গলা অন্য কারো, বোঝা যায় রিমেক। মাঝে মাঝে উড়ে যাচ্ছে অজানা পাখি দু'একটা, জ্যোৎস্না-স্নানে নাকি নীড়-সন্ধানে? কখনো প্যাঁচা চেঁচিয়ে উঠছে রাস্তার ধারের গাছ থেকে। আবার শিশুশিল্পী অন্তরা চৌধুরীর পুরোনো গানটা অনুপমের মনে উসকে দিল চাপা পড়া স্মৃতি।... আয়, আয় রে ছুটে আয়, পুজোর গন্ধ এসেছে...কতো শিউলি ফুটেছে..., উঠোনের এক কোণে শিউলি গাছের অজস্র ফুলের গন্ধ এখন আবেশে আচ্ছন্ন করল তাঁকে। তিন বছর আগে, গৃহপ্রবেশের পরপরই পাড়ার কোনও বধূর দেওয়া এই শিউলি গাছটা নিজে হাতে বসিয়েছিল শিপ্রা। গত বছরেও কিছু ফুল ফুটেছে এ গাছে। সকালবেলা সাজিতে রোজ ফুল তুলে ঠাকুরের সামনে রাখা ছিল ওর নিত্যকার কাজ। এবারে শিপ্রা নেই, সেকথা কি গাছগুলো বোঝে? গত শীতের শেষ দিকে ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে হঠাৎই চলে গেল সে।

শিপ্রার সাধের ছোট্ট বাগানটি মমতাভরে বাঁচিয়ে রেখেছেন অনুপম। দরকারমতো জল দেন, আগাছা পরিষ্কার করেন। এদের মধ্যে যেন তিনি অনুভব করেন স্ত্রীর অশরীরী অস্তিত্ব।

এবার পুজোয় তাই, বাড়ি ফাঁকা। একমাত্র সন্তান ঐন্দ্রিলা বায়োটেকনলজিতে এম এসসি পড়ে। ছুটিতে এসেছে। ঘরে কোনও টিভি প্রোগ্রাম দেখছে; অভ্যাসমতো হাই ভল্যুমে, অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে এখানেও।

পুজোর গন্ধ কথাটা মনে ঘুরছে অনুপমের। আনন্দের যদি গন্ধ হয় তবে দুঃখেরও হতেই পারে।

এক সময় ঐন্দ্রিলা এল... বলল— এখানে মশার কামড় না খেয়ে ঘরে টিভি দেখতে পারতে। অনুপম মাথায় অনুভব করলেন কন্যার করস্পর্শ। কন্যাকণ্ঠে যেন বিগতা গৃহকর্ত্রী তথা চিরন্তন নারীর স্নেহার্দ্র উক্তি ঝরে পড়ল— হিম পড়ছে, ঘরে চল... —হ্যাঁ উঠি এবার... স্মৃতিকাতর অনুপম ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন— তোর মা'র বসানো শিউলি গাছটা কতো বড় হয়েছে, দেখ... ফুলে ফুলে সাদা হয়ে আছে; ...গন্ধটা বড় মিষ্টি লাগছে, তাই না?

—মন্দ নয়।... তবে, আমার একটা পারফ্যুম...তোমায় দেখাব...সুপার্ব...এক্সটিক...অ্যামাজন থেকে অনলাইন কিনেছি...।

অনুপম মনে মনে একটু অপ্রস্তুত হলেন। আজকাল ছেলে- মেয়েদের কি আবেগ কমে যাচ্ছে? কেরিয়ারের ভাবনায়? গ্ল্যামারের আকর্ষণে? প্রাচুর্যের প্রলোভনে? কে জানে...!! তিনিই হয়তো ভুল প্রত্যাশা করেছেন। তথ্য, সংবাদ সকলকে জানানো যেতে পারে, কিন্তু আবেগ আর ভাবের কথার মর্যাদা সবার কাছে আশা করা চলে না। ■

সুপারি কিলার

সন্দীপ চক্রবর্তী

—আপনার নাম কৃষ্ণকমল মিত্র, তাই না?

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনি— আপনাকে তো ঠিক চিনলাম না!

—আমি একজন মানুষ। খাই দাই বগল বাজাই।

—সে তো খুব ভালো ব্যাপার। কিন্তু সব মানুষেরই একটা নাম থাকে। আপনারও নিশ্চয়ই আছে?

—বলব। সব বলব। তবে আপনার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগের কথাটা আগে বলতে চাই।

—অভিযোগ! আমার বিরুদ্ধে? আশ্চর্য! আপনাকে আমি চিনি না অথচ আমার বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ আছে! বেশ, শুনি আপনার কী অভিযোগ।

—আপনি একেবারেই সুবিধের লোক নন মশাই। কোন আক্কেলে আপনি প্রমোটার অরিন্দম বাগচীর নামে থানায় এফ আইআর করলেন?

—আমার সম্বন্ধে বেশ ভালো হোমওয়ার্ক করে এসেছেন দেখছি। তা, কোথায় পেলেন এত খবর?

—খবর হাওয়ায় ভাসে মশাই। এ তল্লাটে আপনি তো এখন বিখ্যাত লোক। কিন্তু অরিন্দম বাগচীর ট্র্যাক রেকর্ড জানলে আপনি এরকম ঝুঁকি নেওয়ার সাহস পেতেন না।

—আমি ওর নাড়িনক্ষত্র সব জানি। তিনটে মার্ডার কেস আছে ওর নামে। রেপ কেস অফিসিয়ালি একটা, আনঅফিসিয়ালি কতগুলো ভগবানই বলতে পারেন।

—আপনি কি জানেন ওই তিনটে মার্ডারের দুটো আমার করা। লোকে গৌরবার্থে অরিন্দম বাগচীর নামটা জড়ায়, খুনের আসল কারিগর আমি।

—মানে! কে আপনি?

—আস্তে কথা বলুন। শীতের সন্ধ্যে হলেও পার্কে লোকজন আছে। আমাদের কথাবার্তা কেউ শুনে ফেললে আমার কাজটা জটিল হয়ে যাবে।

—কী চান আপনি?

—এফ আই আরটা তুলে নিন। তাতে আপনারই মঙ্গল।

—আপনি কি জানেন এফ আই আর কেন করা হয়েছে?

—জানি। অরিন্দম বাগচীর কনস্ট্রাকশন ভেঙে পড়ার ফলে তিন মাস আগে তিনটে বাচ্চা মারা গেছে। রাস্তার ভিখিরিদের বাচ্চা। আপনি ওদের হয়ে লড়াই করছেন।

—সবই তো জানেন দেখছি। এবার তাহলে বলুন, আমার জায়গায় আপনি থাকলে কী করতেন?

—আমার কথা থাক। যা বলছি শুনুন, এফ আই আর তুলে নিন।

—তার চেয়ে আপনি বরং অরিন্দম বাগচীকে গিয়ে বলুন, আমায় থ্রেট করে কোনও লাভ হবে না। আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব।

—কে বলল আমি শুধু আপনাকে থ্রেট করতে এসেছি?

—তাহলে কী করতে এসেছেন?

—আপনার গেম বাজাতে এসেছি মশাই।

—আপনার কথার মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

—এই যন্তরটা চেনেন? একে রিভলবার বলে। নলটা আপনার কানের নীচে ঠেকিয়ে ঘোড়াটা একবার টেনে দিলেই আপনি খরচা হয়ে যাবেন। শেষ দেখার আগেই সব শেষ হয়ে যাবে মশাই।

—বেশ তো, দিন না সব শেষ করে।

—সেটাই তো হয়েছে মুশকিল। সেই কখন থেকে চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতেই পারছি না।

—পারছেন না কেন?

—আচ্ছা, তারিণীপুর হাইস্কুলের কথা আপনার মনে আছে?

—তারিণীপুর—! —হ্যাঁ, মনে থাকবে না কেন?

—আপনি যেবার জয়েন করলেন আমি সেবার ওই স্কুলে ক্লাস টেনের ছাত্র। মাস তিনেক আপনার ক্লাস করার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু এত ভালো লেগেছিল যে অনেকদিন পর্যন্ত ভুলতে পারিনি। আজ যখন আপনাকে দেখলাম তারিণীপুরের সেই স্কুলটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমিও ফিরে গেলাম আমার কিশোরবেলায়। আমি সুপারি কিলার। টাকার বিনিময়ে খুন করাই আমার কাজ। কিন্তু আপনাকে মারতে এসে মনে হলো আপনি মারা গেলে আমার সেই দিনগুলো মরে যাবে। আমাদের সেই সুন্দর গ্রামটা মরে যাবে।

—কী নাম তোমার?

—বাবা-মা'র দেওয়া নাম তো রতন। কিন্তু বোমা বাঁধতে গিয়ে একটা হাত উড়ে গেছে বলে লাইনের ছেলেপুলেরা বলে হাতকাটা রতন।

—একটা কথা বলছি রতন, কিছু মনে করো না। আমাকে মারলে যদি তুমি কিছু টাকা পাও তো মেরে দিতে পারো। মরার ভয় আমি পাই না।

—সে আমি জানি স্যার। অন্য কেউ হলে এতক্ষণে প্যান্টে ইয়ে করে ফেলত। কিন্তু সমাজ-বিরোধী হলেও আমারও তো একটা মন আছে। সেই মন চাইছে বলেই বলছি, আপনি লড়াই চালিয়ে যান স্যার। আজ থেকে আমিও আপনার সঙ্গে আছি।

—আর অরিন্দম বাগচী...তাকে কী বলবে?

—সে যা হোক একটা কিছু বলে দেব। ওসব নিয়ে আপনি ভাববেন না। আপনার কাছে স্যার আমার একটাই অনুরোধ। তারিণীপুর হাইস্কুলের ছবিটা মন থেকে মুছে ফেলবেন না। আজ উঠি স্যার? ভালো থাকবেন। ■

ঘুমের সাতকাহন

শরীরকে সুস্থ, সবল ও স্বাভাবিক কর্মক্ষম রাখতে ঘুমের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অন্যান্য প্রক্রিয়ার মতোই ঘুমও শারীরিক অতি

প্রয়োজনীয়। গভীর ঘুম নানা রোগব্যাধি থেকে দূরে রাখতে পারে আমাদের। ঘুমের অভাবে কাজে অনীহা, মেজাজ তিরিক্ষি, স্মৃতি লোপ এমনই সব লক্ষণ সহজেই দেখা দেয়। দীর্ঘদিন ঠিকমতো ঘুম না হলে এসব উপসর্গ প্রকট হয়ে ওঠে। মানুষ কতদিন না ঘুমিয়ে থাকতে পারে এমন পরীক্ষা মানুষের ওপর করা সম্ভব নয়, তবে বিভিন্ন প্রাণীর ওপর নানাধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। যেমন কুকুরের বেলায় চোদ্দ-পনেরো দিন পর অবস্থা সঙ্কটজনক হয়। অবশেষ ঘুমের অভাবে মৃত্যু ঘটে।

বিজ্ঞানীদের গবেষণায় ঘুমের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছিল। শুধু বিজ্ঞানীদের কেন, সাধারণের মনেও ঘুমের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। এ প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে সহজেই বুঝিয়ে দিয়েছেন, ঘুমের অভাবে আমাদের শারীরিক ক্রিয়াগুলির ব্যাঘাত ঘটে। প্রকট হয়ে ওঠে বিভিন্ন উপসর্গ। ডায়াবেটিস, স্থূলত্ব, হৃদ্‌রোগের মতো নানান রোগে আক্রান্ত হয় আমাদের শরীর। ছোটোদের ক্ষেত্রে নিউরোসাইকোলজিক্যাল সমস্যা, হাইপারটেনশন, ডিপ্রেশন ও কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ার ঝুঁকি থেকে যায়। সঠিক সময়ে চিকিৎসা না হলে মৃত্যুও ঘটে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষায় দেখেছেন ঘুমের অভাবে আমাদের দেশে ভুগছেন প্রায় ১৩.৭ শতাংশ মানুষ।

শরীরের বিশ্রাম হচ্ছে ঘুম। ঘুমের সময় শরীরের অত্যাবশ্যকীয় যাবতীয় কাজ পরিচালিত হয়। আজকাল ডক্তারবাবুরা হার্টের রোগ হলে ইসিজি-র কথা বলেন। ইসিজি করলে হার্টের অবস্থা ধরা পড়ে। তাছাড়া, ইসিজি যন্ত্রে মস্তিষ্কের নানা কাজকর্মেরও হদিস পাওয়া যায়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ঘুমন্ত অবস্থাতেও নানা রকমের রেখালিপি এই যন্ত্রে ধরা পড়ে এবং ঘুম সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। ইসিজি-র লিপি থেকে বিশেষজ্ঞরা ঘুমের সময়কালকে তিনটি অংশে ভাগ করেছেন — লাইট বা হাল্কা, মিডিয়াম বা মাঝারি এবং ডিপ বা গভীর। ঘুমের অনেক মজার বিষয়ও রয়েছে। শুধু মানুষ কেন, সব প্রাণীই কম-বেশি ঘুমিয়ে শরীরকে কর্মক্ষম করে নেয়। মানুষ যেমন শুয়ে ঘুমোয়, তেমনি ঘোড়া ঘুমোয় দাঁড়িয়ে, বাদুর গাছের ডালে ঝুলে দিব্যি ঘুমিয়ে নেয়। বক, সারস, হাঁস এরা এক পায়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোয়। ঘুমের বিচিত্র কৌশল রয়েছে প্রাণীজগতে।

একজন সুস্থ মানুষের দৈনিক সাত-আট ঘণ্টা খুবই জরুরি। তার বেশি ঘুম শরীরে অবসাদ সৃষ্টি করে। যোগশাস্ত্রে বলা হয়েছে,‘ অধিক নিদ্রা জ্ঞানের ব্যাঘাত ঘটায়।’ রামায়ণের কুম্ভকর্ণ ও পুরাণের মুচুকুন্দের কথা আমরা জানি। অতিরিক্ত ঘুম ভালো নয়। কথায় আছে— যে ঘুমিয়ে থাকে তার ভাগ্যও ঘুমিয়ে থাকে। আমাদের দেহ-মনকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখতে পরিমিত ঘুম খুবই জরুরি। ইংরেজিতে একটি খুবই দামি কথা আছে— আর্লি টু বেড অ্যান্ড আর্লি টু রাইজ মেকস এ ম্যান হেলদি ওয়েলদি অ্যান্ড ওয়াইজ।

বিশ্বজিৎ সাহা

ভারতের পথে পথে

ত্রিচুর

কেরলের শিবভূমি ত্রিচুর কোচি রাজাদের প্রাচীন রাজধানী। কালে কালে জামেরিন রাজাদের দখলে যায়। অষ্টাদশ শতকে টিপু, আর টিপুর পরাভবের পর আসে ব্রিটিশ। কেরলের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের পীঠস্থান এই ছোট্ট শহর ত্রিচুর। স্থানীয় উচ্চারণে থ্রিশূর। প্রাচীন গ্রন্থে এর নাম ছিল বৃষভদ্রাপুরম্। নীলগিরি ও পালনি পাহাড়ের মাঝে এক টিলার ওপর কেরলের বৃহত্তম শিবমন্দির বাড়াক্কুনাথন। ৬৫ একর ব্যাপ্ত দ্বাদশ শতক নির্মিত এই মন্দির। প্যাগোডাধর্মী ছাদের কারুকার্যময় মন্দিরে পাথরের নৃত্যরত শিব। বৈশাখ মাসে চারদিনের পুরম্ উৎসবে মেতে ওঠে মন্দির। দূরদূরান্ত থেকে তীর্থযাত্রীদের ঢল নামে তখন।

জানো কি?

- প্রকাশ্য শৌচকর্মবিহীন রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশ।
- পেট্রলের আরেক নাম গ্যাসোলিন।
- কংগ্রেস দলের প্রতিষ্ঠাতা অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম।
- ভারতে লোকসভার আসন সংখ্যা ৫৫২ টি।
- বর্তমানে নির্বাচন হয় ৫৪৩ টিতে।
- ভারতে রাজ্যসভার আসন সংখ্যা ২৫০ টি।
- এপিজে আবদুল কালামের আত্মজীবনী 'উইংস অব ফায়ার'।

ভালো কথা

ভাইফোঁটায় আনন্দ

এবার ভাইফোঁটায় আমরা খুব মজা করেছি। আমি তিনদিন আগে শ্রেয়া ও লিপিকে পরিকল্পনার কথা বলি। তারপর মা'কে বলাতে মা-ও খুশি হয়ে সম্মতি দেন। মা বাবাকে বলাতে বাবা বললেন তোরা কতজনকে ফোঁটা দিবি। আমরা আগেই ভেবে রেখেছিলাম, বললাম সাতজনকে। বাবা বললেন আমি সাতটি মিষ্টির প্যাকেট এনে দেব। কথাটা মা, বাবা, আমি, শ্রেয়া আর লিপি ছাড়া কেউ জানে না। পরে আর চারজনকে বলি। শুনে সবাই খুব খুশি। ভাইফোঁটার দিন প্রথমে আমার দাদুভাইকে, পরে শ্রেয়া, লিপি, মানসী, বুবুন, পিংকি ও দিয়ার দাদুভাইকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমরা ফোঁটা দিয়ে মিষ্টির প্যাকেট দিয়েছি। সাতজন একসঙ্গে গিয়েছিলাম। দাদুভাইরা তো অবাক। আমরা বললাম শুধু আশীর্বাদ করো তাহলেই হবে।

শ্রাবণী সেন, দশম শ্রেণী, ঝালদা, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ণ ব র ন্দ না	(১) বি রী তা প র্থ ক
(২) ল জ ম ঙ্গ হ	(২) বি কা সে মা ন বি

১২ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর
(১) দিবসরজনী (২) কালিকাপুরাণ

১২ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর
(১) নবপত্রিকা (২) নয়নতারা

উত্তরদাতার নাম

(১) মৌমিতা নাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯।(২) আলাপন দলুই, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর (৩) জ্যোতিকৃষ্ণ ঘোষ, ডোমজুর, হাওড়া। (৪) সৌরিন কেশ, তুলসীডাঙ্গা, পূর্ব বর্ধমান।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। অভিমন্যু।। ৩০

ব্যাডমিন্টনে আরও প্রতিভা উঠবে : সঞ্জয়

বাংলার ব্যাডমিন্টনের স্বর্ণযুগে ইন্দ্রজিৎ মুখার্জি, অরিত্র নন্দী, অনিল দে-র সমসাময়িক ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় হয়েও একটি ব্যাপারে তাদের টেক্কা দিয়েছেন সঞ্জয় রায়। প্রবীণদের বিশ্ব মিটে ডাবলসে দেশের হয়ে খেলার ব্যাপারে অনন্য গৌরবের অধিকারী তিনি। খেলোয়াড় জীবনের মতো কোচিংয়ের ক্ষেত্রেও ভাবী প্রজন্মকে সবসময় ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে কোর্টে নামতে উদ্দীপ্ত করে চলেছেন সঞ্জয়। এবারের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক প্রতিবেদন তাকে নিয়েই।

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

□ কীভাবে খেলাটির প্রতি আকৃষ্ট হলেন?

সঞ্জয় : আমার শৈশবটা কেটেছে উত্তরবঙ্গের মালদায়। সেখানে ব্যাডমিন্টনের ভালো পরিবেশ ও পরিকাঠামো ছিল। এখনও আছে। বাবা-মা দুজনেই খেলাটি যথেষ্ট ভালো বোঝেন এবং ভালোবাসেন। মালদায় গৌরচন্দ্র পান, জয়দেব দাস আমাকে খেলাটির ব্যাপারে সবদিক থেকেই সহযোগিতা করেছেন। বাড়ির কাছে ক্লাব হওয়ায় রোজ যেতে যেতে খেলাটির প্রেমে পড়ে যাই। আর হয়তো বা আমার মধ্যে প্রতিভা ছিল বলেই এই দুজন ছাড়া বাবা জ্যোতিপ্রকাশ ও মা বীথিকা রায় নিরন্তর উৎসাহ দিয়ে গেছেন। ফলশ্রুতিতে আমি রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হতে পেরেছি। ১৯৮৪-তে মাধ্যমিক দিয়ে কলকাতায় চলে আসি। এখানে এসে ব্যাডমিন্টনের বৃহৎ ও উন্নত পরিসর পেয়ে যাই যা আমার সার্বিক উত্তরণের 'স্টেপিং স্টোন'।

□ কীভাবে প্রতিটি স্তর অতিক্রম করেছেন?

সঞ্জয় : মালদায় থাকতে জেলা স্তরে সাবজুনিয়র পর্যায়ে প্রতিটি টুর্নামেন্টে ভালো ফল করেছি। উত্তরবঙ্গের সবকটি জায়গায় সমস্ত র‍্যাঙ্কিং টুর্নামেন্টে পদক জেতার সুবাদে রাজ্য ব্যাডমিন্টনের কর্তাদের নজরে পড়ে যাই। যার সুফল পরবর্তীকালে কলকাতায় এসে পেয়েছি। সিনিয়র পর্যায়ে একইরকম ধারাবাহিকতা দেখিয়ে রাজ্য দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলাম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলের হয়ে সারাভারত বিশ্ববিদ্যালয় মিটে খেলি। রাজ্য ব্যাডমিন্টনে সিনিয়র বিভাগে সাতবার ডাবলস খেতাব জিতেছি। সিঙ্গলসে তিনবার রানার আপ হয়েছি। ভাগ্য সহায় ছিল না বলে একবার খেতাব জেতার সন্ধিক্ষণে এসেও হাতছাড়া হয়ে যায়। খেলা ছেড়ে অবশ্য মাস্টার্স মিটে নিয়মিত খেলে গেছি।

□ মাস্টার্স মিটে খেলার অভিজ্ঞতা কীরকম?

সঞ্জয় : জাতীয় পর্যায়ে মাস্টার্স বা ভেটারেন্স মিটে (৪৫+ বয়সগ্রুপ) ২০১৫-তে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। ওই সাফল্যই আমাকে দেশের জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত করে সুইডেনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব মিটে। সুইডেনে গিয়ে আমার সমসাময়িক দুনিয়ার সব কীর্তিখ্যাত খেলোয়াড়দের দেখা, তাদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা ভাগ করার অনুভূতি এক কথায় বোঝানো সম্ভব নয়। আসল সময়ে দেশের হয়ে খেলতে পারিনি বলে যে দুঃখ ছিল তা সুদে-আসলে পুষিয়ে নিয়েছি মাস্টার্স মিটে খেলার সুযোগ পাওয়ায়। ওই টুর্নামেন্টে খেলার অভিজ্ঞতা আমার কোচিংয়েও কাজে আসছে। এর আগে ২০১৩ সালে তুরস্কে অনুরূপ এক প্রতিযোগিতায় খেলাও আমার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা। আধুনিক আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনের নাড়ি-নক্ষত্রের খোঁজ পেয়েছি যা আমার জীবনে বিশেষ মাত্রাবহ।

□ ভাবী প্রজন্মকে কীভাবে তৈরি করছেন?

সঞ্জয় : আমার দুই ছেলে রাতুল ও রমিতকে যেমন ভাবে গাইড করি, ঠিক তেমন ভাবেই আমার কোচিং সেন্টারে সব ছাত্রকে শেখাই। রাতুল স্কুল পর্যায়ে সারা ভারতে ছাপ রাখতে পেরেছে। রায়গঞ্জে রাজ্য জুনিয়র মিটে ডাবলসে খেতাব জয়ী। আর রমিতও স্কুল পর্যায়ে রাজ্য ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন টুর্নামেন্টে ভালো ফল করেছে। ওদের ব্যাপারে আমি আশাবাদী। আর আমার কোচিং সেন্টারে যেসব শিক্ষার্থী আছে তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান। ইতিমধ্যেই তাদের পদচারণা শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন র‍্যাঙ্কিং টুর্নামেন্টে। বেশ কিছু ছেলে-মেয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্যস্তরে প্রতিষ্ঠিত। খেলার টেকনিক, স্কিল উন্নত করার পাশাপাশি জোর দিই ফিটনেস ও রিফ্লেক্স বাড়ানোর দিকে। এর জন্য আলাদা করে প্রশিক্ষণ দিই। আমি পূর্ব রেলেরও কোচ। বিভিন্ন অফিস টুর্নামেন্টে রেল দলকে নিয়ে যাই। আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনে ভারতের বিপুল সম্ভাবনা। এখনই ৩-৪ জন তারকা বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে প্রথম দশে আছে। ভবিষ্যতের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন পেতে পারি সেটাও মনে রাখতে হবে।

অন্য রকম

রাফেল জন

এক হাতে গোলরক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ফুটবলে গোলরক্ষক দলের শেষ প্রহরী। তিনি গোলপোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে দলের দুর্গ রক্ষা করেন। এবং যখনই বিপক্ষ দলের কোনও খেলোয়াড় পেনাল্টি বক্সে ঢুকে শট নেন, গোলরক্ষক লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে দু'হাত দিয়ে বল আটকে দলকে গোল খাওয়া থেকে বাঁচান।

ফুটবল মাঠের পরিচিত ছবিটা এরকমই। কিন্তু যার একটা হাত নেই কিংবা থাকলেও রয়েছে কনুইয়ের সামান্য নীচে পর্যন্ত— অর্থাৎ হাতের চেটো বা আঙুল কিছুই নেই— তিনি কি গোলরক্ষক হতে পারবেন না? অবশ্যই পারবেন। অন্তত রাফেল জনকে যারা চেনেন তারা নির্দ্বিধায় এই কথাই বলবেন। কে এই রাফেল জন? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের যেতে হবে কেরলের এরনাকুলাম জেলার চেল্লানাম শহরে। এখানে জন্ম রাফেলের। মাত্র পাঁচ বছর বয়েসে একটি দুর্ঘটনায় তিনি ডান হাত হারান। ভালোলাগার পৃথিবী আর কঠোর বাস্তব— এই দুইয়ের মাঝখানে দেওয়াল নেমে এসেছিল সেদিন। কারণ ওই বয়েসেই রাফেল ছিলেন ফুটবল-অন্ত-প্রাণ। বিপক্ষ দলের স্ট্রাইকারের পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যখন বলটা ছিনিয়ে নিতেন তখন লেভ ইয়াসিনের সঙ্গে তার কোনও পার্থক্য থাকত না।

অন্য কেউ হলে হয়তো স্বপ্ন-টপ্ন জলাঞ্জলি দিয়ে দৈনন্দিন চাহিদা এবং জোগানের ছকে অভ্যস্ত হয়ে উঠতেন। কিন্তু রাফেল সেরকম নন। তিনি ঠিক করলেন ফুটবলই হবে তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন। ভালো খেলোয়াড় তো তিনি ছিলেনই, তাই স্কুলদলের গোলরক্ষক হিসেবে জায়গা করে নিতে অসুবিধে হলো না। পাশাপাশি স্থানীয় বিভিন্ন ক্লাবের হয়েও খেলতে শুরু করলেন।

তখন তার পনেরো বছর বয়েস। একটি ইন্টারস্কুল প্রতিযোগিতায় তিনি এরনাকুলাম দলে খেলার সুযোগ পেলেন। নিঃসন্দেহে বেশ বড়ো ব্রেক। কিন্তু পরের বছরেই ছবিটা বদলে গেল। কোনও কারণ না দেখিয়েই তাকে দল থেকে বাদ দেওয়া হলো। প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল রাফেলের মুখেই শোনা যাক, 'আমি বেশ হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। যে ক্লাবে তখন খেলতাম সেখানকার সতীর্থ খেলোয়াড়রা আমার পাশে ছিল। ওরা সেই সময় ছোটো ভাইয়ের মতো আমাকে আগলে রেখেছে আর ভালো খেলার জন্য নিরন্তর সাহস আর উৎসাহ জুগিয়ে গেছে।'

চার বছর পর রাফেলের স্বপ্নের পৃথিবীটা একটু একটু করে রূপ নিতে শুরু করে। তিনি ভারতের প্রতিবন্ধী ফুটবল দলে সুযোগ পান। এ মাসের শেষে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী শহর জাকার্তায় বসবে বিশ্ব প্রতিবন্ধী ফুটবলের আসর। এই প্রথম ভারত খেলবে। সেদিক থেকে দেখলে রাফেল জন এক উজ্জ্বল ইতিহাসের অংশীদার হতে চলেছেন।

রাফেল বলেন, 'অ্যাথলেটিক্সের কোচ কিশোর স্যার প্রথম আমাকে প্রতিবন্ধীদের ফুটবল প্রতিযোগিতার কথা বলেন। আমার মতো বিকলাঙ্গ মানুষও যে পেশাদার ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে, এর আগে আমি জানতাম না। ওর উৎসাহ এবং সহযোগিতায় আমি জাতীয় ফুটবলের নিয়ামক সংস্থার কাছে আবেদন করি। এবং আঠারো সদস্যের দলের জন্য নির্ধারিত হই।' এই মুহূর্তে ত্রিচুরে চলছে বিশ্ব প্রতিবন্ধী ফুটবলের প্রশিক্ষণ পর্ব। গরিব পরিবারে জন্ম রাফেলের। কিন্তু ভালোবাসার অভাব কখনও হয়নি। বাবা মা তো বটেই, ভাইবোনেরাও রাফেলের আশৈশব-লালিত স্বপ্নের প্রতি সহানুভূতিশীল থেকেছেন। বাবা মৎস্যব্যবসায়ী, মা গৃহবধূ। যাবতীয় অভাব-অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে ছেলের ফুটবলার হবার আকাঙ্ক্ষার প্রতি সকলেই সমান দায়বদ্ধ। পরিবার সহৃদয় হলেও বাইরের পৃথিবীর ছবিটা কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো। বলা যেতে পারে প্রথমদিকে কেউই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেননি। না কোনও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান, না রাজ্য সরকার। সাহায্য এসেছিল অপ্রত্যাশিতভাবে। মেজর হেমন্ত রাজের কাছ থেকে। রাফেল বলেন, 'মেজর স্যার ওর বোনের কাছ থেকে আমার ব্যাপারে জানতে পেরেছিলেন। একদিন ফোন করে জানতেই চাইলেন, খেলা চালিয়ে যাবার জন্য আমার কী প্রয়োজন? আমি বললাম বুট আর গ্লাভস। মেজর স্যার সেসব কিনে তো দিলেনই, সেই সঙ্গে বিশ হাজার টাকাও দিলেন। ওর ঋণ আমি কোনওদিনও শোধ করতে পারব না। মেজর স্যারের মতো মানুষদের জন্যই আমি আত্মবিশ্বাসী হতে পেরেছি। লক্ষ্যে স্থির থেকে এগিয়ে থাকার সাহস পেয়েছি।'

বলতে বলতে চিক চিক করে ওঠে রাফেলের চোখ। শক্ত হয়ে ওঠে চোয়াল। অসম্পূর্ণ ডান হাতটার দিকে একবার তাকিয়ে তিনি এগিয়ে যান গোলপোস্টের দিকে। উড়ে আসা একটা বল বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে আটকান। শট যিনি নিয়েছিলেন তিনি 'গোল' বলে চিৎকার করতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে থমকান। তাকিয়ে থাকেন রাফেলের দিকে।

রাফেল তখন বলটা শক্ত করে উঠে দাঁড়াচ্ছেন।

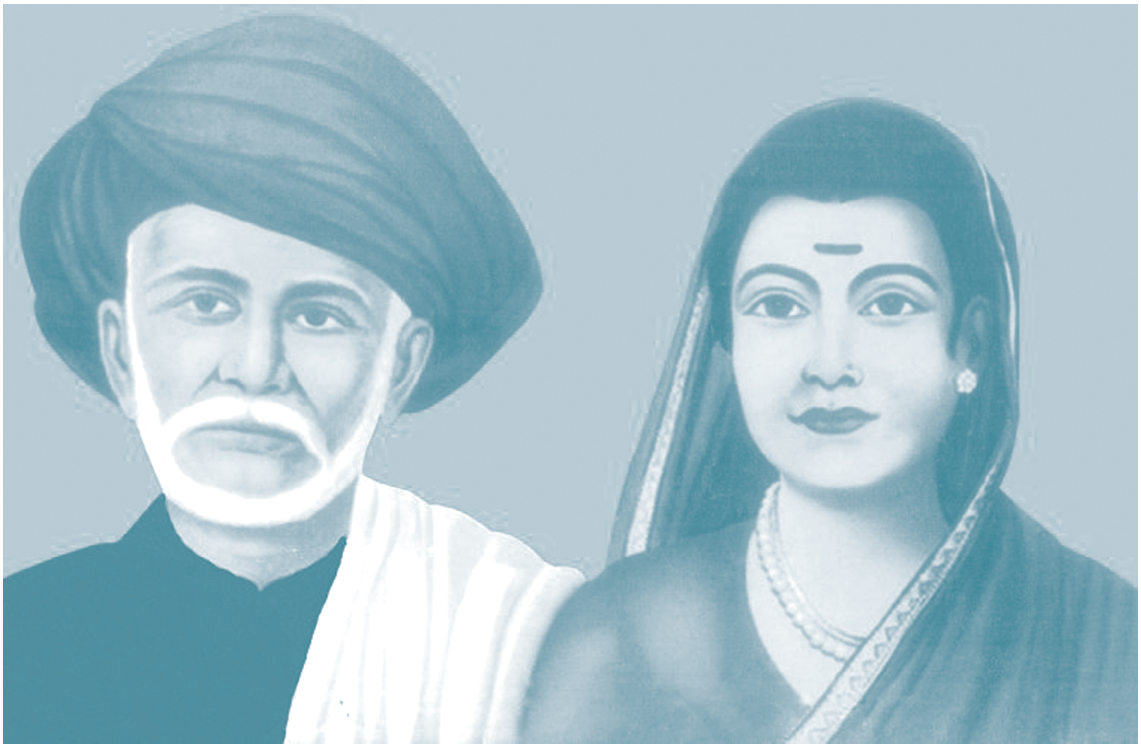

ভারতে নারী জাগরণের অগ্রদূত সাবিত্রীবাই ফুলে

চিন্ময় সেনগুপ্ত

সাবিত্রীবাই ফুলে। হয়তো নামটা শুনেছি, কিন্তু আমরা অনেকেই খুব কম জানি তাঁর কথা। অনেকেই জানি না, আজ যে মেয়েরা নিজেদের নানা বিদ্যায় পারদর্শী করে তুলে সমাজের সর্বস্তরে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারছেন, প্রতিষ্ঠা করতে পারছেন তাঁদের স্বাধিকার, তাঁদের অনন্যতা— এর প্রেক্ষাপটে যাঁর অপরিমেয় অবদান, জীবনব্যাপী সংগ্রাম তথা আত্মনিবেদন— তিনি সাবিত্রীবাই ফুলে।

সাবিত্রীবাই ফুলে ছিলেন ভারতের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ,সমাজ সংস্কারক এবং কবি। উনবিংশ শতকে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এই মহীয়সী মহিলাই তাঁর স্বামী জ্যোতিরাও ফুলের সহযোগিতায় পুণেতে স্থাপন করেছিলেন ব্রিটিশ শাসিত ভারতের প্রথম মেয়েদের স্কুল আর তিনি হয়েছিলেন সে যুগের প্রথম ভারতীয় মহিলা শিক্ষিকা। মেয়েদের বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ প্রথাকে উচ্ছেদ করতে তথা বিধবা বিবাহকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে সাবিত্রীবাই- এর ছিল জীবনব্যাপী আপোশহীন সংগ্রাম। বাল-বিধবাদের শিক্ষিত করে তুলে তাদের সামাজিক ভাবে উন্নত করতে তাঁর প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। শুধু নারী জাগরণের জন্যই নয় সেই সময়ের দুটি অমানবিক প্রথা অস্পৃশ্যতা এবং বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সাবিত্রীবাই লড়াই করেছেন সারাজীবন ধরে।

সাবিত্রীবাই জন্মেছিলেন দলিত নিম্নবর্ণ শ্রেণীর পরিবারে ১৮৩১ সালের ৩ জানুয়ারি, মহারাষ্ট্রের সাতরা জেলার নইগাঁও গ্রামে। সে সময়ে বাল্য বিবাহের প্রচলন থাকায় ১৮৪০ সালে ৯ বছরের সাবিত্রীবাই-এর বিয়ে হয় ১২ বছরের কিশোর জ্যোতিরাও এর সঙ্গে। পরবর্তীকালে এই জ্যোতিরাও হয়েছিলেন মহারাষ্ট্রে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।

সাবিত্রীবাই-এর শিক্ষা শুরু হয়েছিল বিয়ের পর থেকে। সহধর্মিণীর মধ্যে নিজেকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য গভীর আগ্রহ, নিষ্ঠা ও প্রত্যয় দেখে জ্যোতিরাওই তাঁকে পড়তে ও লিখতে শেখান। ধীরে ধীরে আরও অন্যান্য শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে নিজেকে যোগ্য করে

তোলেন সাবিত্রীবাই। পড়তে পড়তে তাঁর মধ্যে পড়ানোর ইচ্ছা জেগে উঠলে আহমেদ্‌নগরের শ্রীমতী ফারার-এর প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাদান বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন তিনি। নিজের সামাজিক মূল্য উন্নত করার সব রকমের প্রচেষ্টায় সাবিত্রীবাইকে সার্বিকভাবে অনুপ্রাণিত করেন জ্যোতিরাও।

অবশেষে ১৮৪৮ সালে জ্যোতিরাও ও সাবিত্রীবাই-এর যৌথ প্রচেষ্টায় পুণেতে স্থাপিত হয় ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের মেয়েদের প্রথম স্কুল। সাবিত্রীবাই ভারতের প্রথম মহিলা শিক্ষিকা হন। যদিও তখন তার বয়স কুড়ি পৌঁছয়নি। এই মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করার জন্যে ফুলে দম্পতিকে বহিষ্কৃত করেছিল তাদের পরিবার, পরিহার করেছিল সমগ্র দলিত সমাজ। কিন্তু এই নির্বাসিত দম্পতিকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাদের বন্ধু ওসমান শেখ ও তার বোন ফতেমা। তাঁদের গৃহপ্রাঙ্গণেই আবার শুরু হলো স্কুল।

এরপর জ্যোতিরাও-সাবিত্রীবাই, সমাজে অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত মাঙ্‌ আর মাহর এই দুই নিম্ন বর্ণের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্যে স্কুল প্রতিষ্ঠায় মন দেন। ১৮৫১ সালে ৩ জুলাই ও ১৭ নভেম্বর এবং ১৮৫২ সালের ১৫ মার্চ পরপর এইরকম তিনটি স্কুল স্থাপন করেন তাঁরা। ১৮৫২ সালের ১৬ নভেম্বর ব্রিটিশ সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদানের জন্য ফুলে দম্পতিতে সম্মানিত করেন এবং সেরা শিক্ষিকা হিসেবে পুরস্কৃত করেন সাবিত্রীবাইকে। অনুপ্রাণিত হয়ে ওই বছরই মেয়েদের স্বাধিকার, সামাজিক সম্মান এবং অন্যান্য সামাজিক অপসংস্কৃতির বিষয়ে সচেতন করে তুলতে গড়ে তোলেন 'মহিলা সেবা মণ্ডল'।

দুঃখের বিষয় ১৮৫৭ সালে মহাসংগ্রামের প্রতিক্রিয়া হিসেবে সরকারি ও অন্যান্য অনুদান বন্ধ হয়ে গেলে ওই তিনটি স্কুলও ১৮৫৮ সালে বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু এই দুঃসহ পরিস্থিতিতেও থেমে থাকেননি ফুলে দম্পতি। নিপীড়িত নিম্নবর্ণের দলিত শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের ব্রত নিয়ে তারা অগ্রসর হয়েছিলেন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। আর কয়েক বছরের মধ্যেই সংগ্রামের সঙ্গী ফতেমাকে নিয়ে ফুলে দম্পতি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন এইরকম ১৮টি স্কুল।

কিন্তু শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে নীচু বর্ণের এই নব জাগরণের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল সমাজের লোকজন। ফলে সাবিত্রীবাই ও ফতেমাকে নানাভাবে নির্যাতিত ও অপমানিত হতে হয়েছিল। সাবিত্রীবাই যখন স্কুলে যোগ দিতে যেতেন তখন তার উপর নিক্ষেপ করা হতো কাদা, গোবর, আবর্জনা এমনকী পাথর পর্যন্ত। কিন্তু এইসব অসভ্য উপদ্রবেও একটুও বিচলিত হননি সাবিত্রীবাই। প্রতিদিন তিনি আরও একটি অতিরিক্ত শাড়ি নিয়ে স্কুলে আসতেন। আর রাস্তায় নানারকমের অত্যাচারে নোংরা হয়ে যাওয়া শাড়িটি পরিবর্তন করে অন্য শাড়িটি পরে আবার ক্লাস নিতে শুরু করতেন।

ফুলে দম্পতি ১৮৫৫ সালে স্থাপন করেছিলেন একটি নৈশ বিদ্যালয়। চাষি আর খেতমজুররা যাতে সারাদিনের চাষের কাজের পর সন্ধ্যায় স্কুলে এসে পড়াশোনা শিখতে পারে সেই জন্যেই ছিল এই নৈশ বিদ্যালয়ের প্রয়াস।

স্কুল ছুটদের সংখ্যা কমাতে সাবিত্রীবাই নিয়মিত উপস্থিত হওয়া ছেলেমেয়েদের জন্যে প্রচলন করেছিলেন স্কুলের তরফ থেকে আর্থিক অনুদান। এছাড়াও শিক্ষিকাদের নিয়ে নিয়মিত অভিভাবক সম্মেলন করতেন সাবিত্রীবাই। এই ভাবে অভিভাবকদের শিক্ষার তাৎপর্য এবং প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন করে তুলতেন যাতে তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের নিয়মিত স্কুলে পাঠান।

১৮৬৩ সালে ফুলে দম্পতি গড়ে তোলেন 'বাল হত্যা প্রতিবন্ধক গৃহ' যেটি নবজাত শিশু হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত ভারতের সর্বপ্রথম পরিচর্যা কেন্দ্র। এই কেন্দ্রটি গড়ে তোলার পিছনে কারণ ছিল, যাতে বিধবা এবং অবিবাহিত মেয়েরা যৌন নিপীড়নের শিকার হয়ে গর্ভবতী হলে নিরাপদে এবং নিশ্চিন্তে তাদের সন্তানদের জন্ম দিতে পারে এবং এই ভাবে বিধবাদের সকরুণ আত্মহত্যা এবং নবজাত শিশুহত্যা থেকে সমাজকে রক্ষা করা যায়।

এই বালহত্যার প্রতিরোধের সূত্র ধরেই ১৮৭৪ সালে নিজেরা নিঃসন্তান ছিলেন বলে ফুলে দম্পতি একজন নির্যাতিতা ব্রাহ্মণ বিধবা কাশিবাই-এর সন্তানকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করেন। এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ছিল তৎকালীন সমস্ত প্রগতিশীল মানুষের কাছে, উচ্চবর্ণের রক্ষণশীল সমাজের কাছে বালহত্যার বিরুদ্ধে এক জোরালো বার্তা। সেই দত্তকপুত্র যশোবন্তরাও পরবর্তীকালে হয়ে উঠেছিলেন একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক, সমাজ সেবায় যাঁর অবদানও ছিল উল্লেখযোগ্য।

এইসব সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিরাও যেমন আন্দোলন গড়ে তুলছিলেন বিধবা বিবাহের সমর্থনে, তেমনি সাবিত্রীবাই অক্লান্ত ভাবে সংগ্রাম করে চলছিলেন দুটি অত্যন্ত সংবেদনশীল সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে— একটি মেয়েদের বাল্যবিবাহ অন্যটি সতীদাহ প্রথা। সাবিত্রীবাই নানাভাবে চেষ্টা করতেন কীভাবে বাল্যবিধবাদের শিক্ষিত করে তুলে সমাজের অকারণ অবহেলা থেকে তাদের রক্ষা করা যায়, এমনকী সম্ভব হলে বিধবা বিবাহের মাধ্যমে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যায়।

শুধু তাই নয় সাবিত্রীবাই তাঁর স্বামীর সঙ্গে একযোগে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে উৎসর্গ করেছিলেন সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতা এবং বর্ণবৈষম্যের মতো অমানবিক প্রথা দুটিকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করতে। লাগাতার আন্দোলনে সোচ্চার হয়েছিলেন মানুষের সমানাধিকার নিয়ে। তখন অস্পৃশ্যতা প্রথার এমন দাপট ছিল যে কোনও জলাধারে অস্পৃশ্য মানুষের ছায়া পড়লেও সেই জল অপবিত্র এবং সম্পূর্ণভাবে পানের অযোগ্য বলে মনে করা হতো। এমনকী কোনও অস্পৃশ্য মানুষ প্রচণ্ড তৃষ্ণার্ত হয়ে জল চাইলেও তাকে পানীয় জল দিতে লোকে কুণ্ঠিত হতো। আন্দোলনে নেমে তাই সাবিত্রীবাই বাধ্য হয়েছিলেন নিজেদের বাড়িতে অস্পৃশ্যদের ব্যবহারের জন্য কূপ খনন করতে।

১৮৭৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জ্যোতিরাও পুনেতে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, অ-ব্রাহ্মণ, সরকারি আমলা সবাইকে নিয়ে বৃহত্তর পর্যায়ে কাজ করার জন্যে প্রতিষ্ঠা করেন 'সত্যশোধক সমাজ'। এই সমাজের উদ্দেশ্য ছিল জাতিবর্ণ নির্বিশেষে মেয়েদের ও অন্যান্য অনগ্রসর এবং অবহেলিতদের সামাজিক নির্যাতন ও শোষণের থেকে মুক্ত করা। সাবিত্রীবাই ছিলেন এই সমাজের অন্যতম সক্রিয় সদস্যা।

অন্যান্য নানাবিধ কার্যক্রম ছাড়াও এই সমাজের একটি কাজ ছিল বিনা পণে বিনা পুরোহিতে নামমাত্র খরচে বিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা। অনেকটা আজকের রেজিস্ট্রি ম্যারেজের মতো। সেই সময় এইসব বিবাহ অনুষ্ঠানে পাত্র-পাত্রী দুজনকেই শপথ বাক্য পাঠ করানো হতো এবং সমস্ত সমাজের কাছে সেই ছিল তাদের সারাজীবনের অঙ্গীকার। 'সমাজ'-এ এইরকম প্রথম বিবাহটি অনুষ্ঠিত হয় ২৫ ডিসেম্বর ১৮৭৩ সালে সাবিত্রীবাই-এর দুই বন্ধুর পরিবারের মধ্যে তাঁরই সম্পূর্ণ খরচে। নিজেদের দত্তক পুত্র যশোবন্তরাও-এর বিয়েও ফুলে দম্পতি একইভাবে দিয়েছিলেন ১৮৭৯ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি।

বাবাসাহেব আম্বেদকর

১৮৭৬ সালে মহারাষ্ট্রে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে 'সমাজ'কে নিয়ে সাবিত্রীবাই ও তাঁর স্বামী অসাধারণ সাহসিকতার সঙ্গে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন সমাজ সেবার কাজে। অঞ্চলে অঞ্চলে বিনামূল্যে বুভুক্ষু মানুষকে খাদ্য সরবরাহ করতেন তাঁরা। শুধু তাই নয় সাবিত্রীবাই এর পরিচালনায় সারা মহারাষ্ট্রে খোলা হয়েছিল ৫২টি খাদ্য বিতরণ শিবির।

১৮৯৭ সালে মহারাষ্ট্রে খরা উপস্থিত হলে সাবিত্রীবাই নিজের প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ সরকারকে ত্রাণকার্য শুরু করতে অনুপ্রাণিত করে খরা-কবলিত অঞ্চলগুলিতে ত্রাণের ব্যবস্থা করেন।

ওই বছরই মহারাষ্ট্রের নাল্লাসপোরা অঞ্চলে দেখা দিল মারণব্যাধি প্লেগ। ধীরে ধীরে তা যখন ছড়িয়ে গেল মহামারীর আকারে তখন সাবিত্রীবাই আর শান্ত থাকতে পারলেন না। পালিত পুত্র যশোবন্তরাও তখন পুণে শহরের নামকরা ডাক্তার। ডাক্তার পুত্রকে পাশে নিয়ে মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন সাবিত্রীবাই। তাঁদের প্রচেষ্টায় পুণে শহরের উপকণ্ঠে প্রতিষ্ঠিত হলো প্লেগ আক্রান্তদের সেবার উদ্দেশ্যে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়। নানা জায়গা থেকে সন্ধান করে করে সাবিত্রীবাই প্লেগ রোগীদের উপস্থিত করতেন সেই চিকিৎসালয়ে যেখানে রোগীরা পেত তাঁর ডাক্তার পুত্রের চিকিৎসা এবং তাঁর ব্যক্তিগত পরিষেবা।

এইভাবে প্লেগ রোগীদের পরিচর্যা করতে করতে এক সময় সাবিত্রীবাই নিজেই এই সংক্রামক প্লেগ রোগে আক্রান্ত হলেন আর ১৮৯৭ সালের ১০ মার্চ রাত্রি ৯টায় পুত্রের কোলে মাথা রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

দুঃখের কথা দেশ সাবিত্রীবাইকে ভুলে ছিল প্রায় একশো বছর ধরে। বহু বিলম্বে হলেও অবশেষে ঘুম ভাঙে প্রশাসনের। ১৯৮৩ সালে অর্থাৎ সাবিত্রীবাই-এর দেহাবসানের ৮৬ বছর পর পুণের সিটি কর্পোরেশন তাঁর নামে প্রতিষ্ঠা করে এক স্মৃতি মন্দির।

এরপরেই সামাজিক কলঙ্ক মোচনে সাবিত্রীবাই-এর অক্লান্ত প্রচেষ্টা সেই সঙ্গে দুর্বার আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের ব্রতপালনে তাঁর আত্মহুতির কথা স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানাতে এগিয়ে আসেন সমাজের সব শ্রেণীর মানুষ। তাঁকে নিয়ে তৈরি হয় একাধিক ফিল্ম, নাটক, সংগীত। প্রতিষ্ঠিত হয় শতাধিক শিক্ষাসত্র।

১৯৯৮ সালে ১০ মার্চ তাঁর মৃত্যু দিবসে ভারতীয় ডাক বিভাগ তাঁর সম্মানে প্রকাশ করে একটি ডাক টিকিট। ২০১৫ সালে পুণে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নামকরণ করে হয়---সাবিত্রীবাই ফুলে পুণে বিশ্ববিদ্যালয়। ২০১৭ সালের ৩ জানুয়ারি সাবিত্রীবাই-এর ১৮৬তম জন্মদিনে তাঁর প্রতি আন্তর্জাতিক ভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে 'গুগল্'।

পরিশেষে জানাই, সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষাব্রতী, নারী জাগরণের অগ্রদূত সাবিত্রীবাই-এর নানা পরিচয়ের পরেও রয়েছে আর একটি বিশেষ পরিচয়। তিনি ছিলেন ঊনবিংশ শতকের ভারতের একজন জনপ্রিয় মহিলা কবি।

জনজাগরণে বিশেষ করে জনজাতি সমাজের নির্যাতিত, নিপীড়িত নারীদের শিক্ষার উপযোগিতা সম্পর্কে সেই সঙ্গে জাতি ভেদ, অস্পৃশ্যতা প্রকৃতি অমানবিক প্রথা সম্পর্কে সজাগ করে তুলতে ছোটো ছোটো সহজবোধ্য সরল স্বরচিত কবিতাগুলি ছিল সাবিত্রীবাই-এর হাতিয়ার। দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল কবিতাগুলি, উদ্বুদ্ধ করেছিল হাজার হাজার নিম্নবর্ণের মহিলাকে। এমনই একটি কবিতা এইরকম :

যাও, যা কর পড়ো-লিখো, বনো আত্মনির্ভর
বনো মেহনতী
কাম করো—জ্ঞান অউর ধন একট্‌ঠা করো
জ্ঞান কে বিনা সব খো যাতা হ্যায়, জ্ঞান কে বিনা
হম জানবর বন যাতে হ্যায়
ইসলিয়ে খালি না বৈঠো, যাও, যা কর শিক্ষা লো
তুম্‌হারে পাস শিখনে কা সুনহরা মৌকা হ্যায়
ইসলিয়ে শিখো অউর জাতি কে বন্ধন তোড় দো।

সাংবাদিক চাই

স্বস্তিকা পত্রিকায় অসম এবং ত্রিপুরার খবরের অভাব অনেকদিন ধরেই আমরা অনুভব করছি। আমরা মনে করি ওই দুই রাজ্যে বসবাসকারী বাঙ্গালিদের জীবনধারণের প্রকৃত ছবিটি পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিদের কাছে তুলে ধরা দরকার। তাই, ত্রিপুরার আগরতলা এবং উত্তর অসমের শিলচরের যুবক-যুবতীদের প্রতি আমাদের আবেদন, নিউজ রিপোর্টিংয়ে যদি কারও আগ্রহ থাকে তাহলে অবিলম্বে নীচে দেওয়া ঠিকানায় এক কপি পাসপোর্ট-সাইজ ছবি-সহ সংক্ষিপ্ত জীবনীপঞ্জি পাঠান। জীবনীপঞ্জি ই-মেলও করা যেতে পারে। বিস্তারিত জানার জন্য ফোন করুন সম্পাদকীয় দপ্তরের ফোন নম্বরে।

স্বস্তিকা

২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬
Email : swastika 5915@gmail.com
সম্পাদকীয় দপ্তরের ফোন নম্বর : ৮৪২০২৪০৫৮৪

চার বছরে মৎস্য উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি : দাবি কৃষিমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কেন্দ্রীয় কৃষি এবং কৃষককল্যাণ মন্ত্রী রাধামোহন সিংহ কলকাতার ব্যারাকপুরে ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউটে আয়োজিত 'ইনল্যান্ড

ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট' নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলাকালীন সংস্থার আধিকারিক এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের জন্য উপস্থিত যুবক-যুবতীদের উদ্দেশে বক্তব্য রেখেছেন। কেন্দ্রীয় কৃষি এবং কৃষককল্যাণ মন্ত্রী রাধামোহন সিংহ যুবক-যুবতীদের উদ্দেশে বলেন যে, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিগত সাড়ে চার বছরে দেশে মৎস্যচাষ উন্নয়নের জন্য 'নীল বিপ্লব' শুরু করা হয়েছে। ফলে, কয়েকটি রাজ্য মৎস্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

মৎস্য উৎপাদন বিগত চার বছরে ২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া, মৎস্য উৎপাদন এবং সামুদ্রিক মৎস্যজাত বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানি ৯৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের দেশে কৃষকদের রোজগার দ্বিগুণ করার ক্ষেত্রে মৎস্যচাষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রকাশ্যে শৌচকর্ম বর্জিত পশ্চিমবঙ্গের অঙ্গীকার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ চলতি বছরের ডিসেম্বর মাস নাগাদ পশ্চিমবঙ্গকে প্রকাশ্য স্থানে শৌচকর্ম বর্জিত রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করতে সরকার বদ্ধপরিকর বলে জানালেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার কলকাতায় পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে প্রকাশ্য স্থানে শৌচকর্ম বর্জনের বর্তমান হাল-হকিকত, কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং গ্রামীণ জল সরবরাহ নিয়ে আয়োজিত আঞ্চলিক পর্যালোচনা বৈঠকে শ্রী মুখোপাধ্যায় একথা জানান। বৈঠকে প্রকাশ্য স্থানে শৌচকর্ম বর্জিত গ্রামগুলির যাচাই, অব্যবহৃত শৌচাগারগুলিকে ব্যবহার করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার কাজে স্বেচ্ছাগ্রহীদের শামিল করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হয়।

গ্রামীণ স্বচ্ছতা প্রসঙ্গে শ্রী মুখোপাধ্যায় বলেন, রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে স্বচ্ছতার বর্তমান পরিধি ৯৭ শতাংশ। খুব শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশ্য স্থানে শৌচকর্ম বর্জিত রাজ্য হয়ে উঠতে চলেছে। ২০১৯-র অক্টোবর মাস নাগাদ সমগ্র দেশকে স্বচ্ছ করে তোলার যে জাতীয় লক্ষ্য স্থির হয়েছে, তার অনেক আগেই রাজ্যে এ কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

বৈঠকে কেন্দ্রীয় পানীয় জল ও পরিচ্ছন্নতা মন্ত্রকের সচিব পরমেশ্বরণ আইয়ার, আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে রাজ্যের গ্রামাঞ্চলকে প্রকাশ্য স্থানে শৌচকর্ম বর্জিত হিসেবে ঘোষণা করার জন্য যে অঙ্গীকার করা হয়েছে, সে ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকার প্রশংসা করেন। একইভাবে ঝাড়খণ্ডের গ্রামাঞ্চলকেও প্রকাশ্য স্থানে শৌচকর্ম বর্জিত হিসেবে ঘোষণা করার জন্য তিনি রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন জানান। সাধারণ মানুষের মানসিকতায় পরিবর্তন আনার জন্য যে প্রয়াসগুলি চালানো হচ্ছে, তা ভবিষ্যতেও বজায় রাখার ওপর শ্রী আইয়ার গুরুত্ব দেন।

সড়ক পরিকাঠামো ও ফুটপাথ সংক্রান্ত প্রযুক্তি বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সিএসআইআর এবং কেন্দ্রীয় সড়ক গবেষণার উদ্যোগে সড়ক পরিকাঠামো ও ফুটপাথ সংক্রান্ত দু'দিনের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এই সম্মেলনে সারা বিশ্বে সড়ক পরিকাঠামো নির্মাণ এবং ফুটপাথ বিষয়ক প্রযুক্তি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতবিনিময় করা হয়। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নীতীন গড়করি এই সম্মেলনে এক ভিডিও বার্তায়, স্বল্প ব্যয়ে উচ্চ গুণমানসম্পন্ন সড়ক নির্মাণের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তিনি দেশজ কাঁচামাল, বিশেষ করে বর্জ্য পদার্থ ব্যবহার করে সড়ক নির্মাণের ওপর জোর দেন। যথাযথ গুণমান বজায় রেখে কম সময় ও খরচে সড়ক নির্মাণের জন্য প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের কথাও বলেন।

এই সম্মেলনে সড়ক নির্মাণের পাশাপাশি উন্নতমানের ফুটপাথ নির্মাণের কথাও আলোচনা হয়। সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় ২৫০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। এদের মধ্যে গবেষক, বিশেষজ্ঞ, প্রযুক্তিবিদ এবং শিল্প সংস্থার প্রতিনিধিরাও রয়েছেন। সড়ক নির্মাণ সংক্রান্ত গবেষণা ও প্রযুক্তি বিষয়ে এই সম্মেলনে গবেষকরা ৪৫টি প্রযুক্তিগত প্রদর্শন পেশ করেন।

স্টার্ট আপের ক্ষেত্রে ভারত গ্লোবাল হাব হয়ে উঠবে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভারতের অগ্রগতিতে আমূল পরিবর্তন আনার ক্ষমতা দেশের স্টার্ট-আপগুলির রয়েছে। ভারতীয় স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম ২০১৮ শীর্ষক এক রিপোর্ট প্রকাশ অনুষ্ঠানে একথা বলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী সুরেশ প্রভু। 'ইঙ্ক ৪২' নামে একটি সংস্থা এই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। সংস্থাটি ভারতীয় স্টার্ট-আপ ক্ষেত্রের হাল-হকিকত সংক্রান্ত তথ্যের মঞ্চ হিসাবে পরিচিত।

দেশে স্টার্ট-আপ বা নতুন শিল্পোদ্যোগ স্থাপনের জন্য এক অনুকূল বাতাবরণ প্রদানে মন্ত্রক একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এই লক্ষ্য পূরণে ঐতিহ্যবাহী শিল্প বিষয়ক যে সমস্ত নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা রয়েছে, তা

আরও সরল করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। উদ্দেশ্য হলো, ভারতে স্টার্ট-আপ ক্ষেত্রের শিকড়কে আরও গভীরে প্রোথিত করতে উৎসাহিত করা এবং এই ক্ষেত্রটিকে উৎসাহ দেওয়া।

শ্রী প্রভু আরও জানান, দেশে স্টার্ট-আপ ক্ষেত্রে লগ্নি বৃদ্ধির জন্য আগামী মাসে এক বিশ্ব বিনিয়োগকারী গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে এই উদ্যোগের ফলে স্টার্ট-আপ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পথ আরও সুগম হবে। সহজে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশ্ব ক্রমতালিকায় ভারতের অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে শ্রী প্রভু বলেন, ভারত যাতে প্রথম ৫০টি দেশের মধ্যে জায়গা করে নিতে পারে তার জন্য যাবতীয় প্রয়াস চালানো হচ্ছে। নতুন ধ্যান-ধারণা ও উদ্ভাবনের প্রয়োগ ঘটিয়ে ভারতীয় যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে যে উদ্যম ও আন্তরিকতা রয়েছে তা কেবল দেশের জন্যই নয়, বরং সমগ্র বিশ্বেই ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে বলেও শ্রী প্রভু অভিমত প্রকাশ করেন।

ইস্পাত উৎপাদনে দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভারত উল্লেখযোগ্য সামগ্রীর সম্পদে পরিপূর্ণ, যা দেশের শিল্প ক্ষেত্রের অগ্রগতির পাশাপাশি, অর্থনৈতিক উন্নয়নেও সাহায্য করে। জাতীয় ইস্পাত নীতি ২০১৭ অনুযায়ী ভারতের উৎপাদন ক্ষমতা ২০৩০ সালের মধ্যে বাড়িয়ে ৩ কোটি টন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বে আমরা ইস্পাত উৎপাদনকারী দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রকের সচিব বিনয় কুমার ৫৬তম জাতীয় ধাতুবিদ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে কলকাতায় একথা জানান। এই অনুষ্ঠানটি ইস্পাত মন্ত্রক ও আই আই এম যৌথভাবে আয়োজন করেছে। শ্রী কুমার বলেন, ভারতে ইস্পাতের মূল্য ৬৯ টাকা প্রতি কেজি, অন্যদিকে বিশ্বে গড়ে এই হার ২১৪ টাকা প্রতি কেজি।

শ্রী কুমার বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন করেছে। এর ফলে, স্বল্প মূল্যে ইস্পাতের ব্যবহার করা সম্ভব হবে। সচিব বলেন, ভারত'কে এখনও অতিরিক্ত ইস্পাত ক্ষমতাসম্পন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। ৩৯টি দেশ ইতিমধ্যেই এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইস্পাত কারখানাগুলিতে নিরাপত্তার বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি বলেন, সেইল এই বিষটিতে যথাযথ গুরুত্ব দেয়। শ্রী কুমার ৫৬তম জাতীয় ধাতুবিদ দিবস উপলক্ষে দেশের সফল ধাতুবিদদের পুরস্কার প্রদান করেন। রৌরকেল্লা ইস্পাত কারখানার প্রাক্তন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সনক মিশ্রকে জীবনকৃতী সম্মান দেওয়া হয়। গবেষণা ও পঠন-পাঠন বিষয়ক কাজের জন্য টাটা স্টিলের ড. সঞ্জয় চন্দ্র এবং আই আই টি খড়্গপুরের অধ্যাপক ইন্দ্রনীল মান্না পুরস্কার পান। ইস্পাত সচিব এ বছরের সেরা ধাতুবিদ পুরস্কার প্রদান করেন। দেওয়া হয় তরুণ ধাতুবিদ পুরস্কার। গুণগত মানের দিক থেকে পুরস্কার পায় আই আই এম।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিদলের ত্রিশক্তি বাহিনী সফর

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর ২০ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ভারতীয় সেনাবাহিনীর ত্রিশক্তি দল পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে ৫ দিনের ভারত সফরে এসেছে। প্রতিনিধিদলটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন মেজর জেনারেল এ এইচ এস হাসান। ফুলবাড়িতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে প্রতিনিধিদলটি এসে পৌঁছলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর আধিকারিকরা তাঁদের স্বাগত জানান। এরপর ওই দলটি ভারতীয় সেনাবাহিনীর দার্জিলিং শাখার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান।

সফরকালে প্রতিনিধি দলটি ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিভিন্ন শাখা ঘুরে দেখবে এবং তাঁদের নানা উদ্যোগ ও সেনা প্রশিক্ষণ প্রত্যক্ষ করবে। প্রতিনিধি দলটিকে পার্বত্য এলাকার যুদ্ধ বিষয়ক প্রশিক্ষণের বিষয়ে জানানো হবে এবং দার্জিলিংয়ের এইচ এম আই-সহ নানা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দেখানো হবে।

দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে সহযোগিতা আরও মজবুত করার লক্ষ্যেই সেনা প্রতিনিধিদের এই সফর। এই ধরনের সফরের ফলে সহযোগিতা বাড়বে এবং পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আগামীদিনে আরও মজবুত হবে।

ইন্দোনেশিয়ার জেল এখন জেহাদি তৈরির আঁতুড়-ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ইন্দোনেশিয়ার ৪৭৭টি জেলে বন্দি ধরার কথা এক লক্ষ পঁচিশ হাজারের মতো। বর্তমানে সেখানে বন্দির সংখ্যা ছাড়িয়েছে দু' লক্ষ চুয়ান্ন হাজারের বেশি। সূত্রের খবর, দক্ষিণ কালিমান্তান জেলে যেখানে অপরাধী ধরার কথা ৩৬৬ জন, সেখানে এখন সংখ্যাটা আড়াই হাজারের কাছাকাছি। জাকার্তার উচ্চ- নিরাপত্তাযুক্ত জেলে নয় স্কোয়ার মিটার সেলে পনেরো কয়েদি গাদাগাদি করে আছে, এমন দৃশ্যও এখন হামেশাই দেখা যাচ্ছে। কী ভাবছেন? ইন্দোনেশিয়ায় অপরাধ প্রবণতা হঠাৎ বেড়ে গিয়েছে? অপরাধ প্রবণতা বেড়েছে ঠিকই। তবে নেহাত ছিঁচকে চুরি বা রাহাজানির মতো অপরাধ নয়। জেহাদি কর্মের আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়েছে ইন্দোনেশিয়ার কারাগারগুলি। এমন নয় যে দেশে সন্ত্রাসবাদ চালানোর অভিযোগে অভিযুক্তকে এখানে পোরা হচ্ছে। এটা বরং জেহাদিদের সুকৌশলী ফাঁদ। মামুলি অপরাধে অপরাধী জেলে ঢোকার পর তাকে সেখানেই সন্ত্রাসবাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

এই মগজ ধোলাইয়ের নানা পন্থা। প্রথমত, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভের আবহ তৈরি করা যাচ্ছে সহজেই। দ্বিতীয়ত, অপরাধ-প্রবণতা বিচার করে অপরাধী মনকে আরও বড়ো অপরাধের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। এভাবেই সুকৌশলে ইন্দোনেশিয়ার জেলকে নিজেদের প্রশিক্ষণ-শিবিরে পরিণত করে তুলতে পেরেছে জেহাদিরা। এমনকী দেশে অপরাধ প্রবণতা বাড়িয়ে তুলতেও সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে তারা। এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে জাকার্তার একটি মুখ্য থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর পলিসি অ্যানালিসিস অব কনফ্লিক্ট (আই পি এ এসি)-র সমীক্ষায়। এই সমীক্ষায় নেতৃত্ব দেন সমীক্ষক সিডনি জোনস।

সূত্রের খবর, ২০০৪ সালে গ্রেপ্তার হয় আমান আবদ্দুরাহমান নামে এক ব্যক্তি। জাকার্তার কাছে একটি বোমা-তৈরির কারখানায় আচমকা বিস্ফোরণ ঘটায় অভিযুক্ত হিসেবে ধরা হয় তাকে। কিন্তু জেলে গিয়েই জেহাদি হিসেবে আসল কেরিয়ার শুরু হয় তার। জেলে চোদ্দ বছর কাটিয়ে এখন তার সেলেই নিজস্ব একটি জেহাদি ইউনিট চালাচ্ছে সে, আই পি এসির সমীক্ষায় তেমনই প্রকাশ। আই সিসের প্রায় ১১৫টি জেহাদি প্রবন্ধ সেদেশের ভাষায় অনুবাদ করে অনলাইনে তুলে ও বন্দিদের মধ্যে বিলিয়ে তাদের মগজ ধোলাইয়ের কাজটা মুখ্যত সেই করে। এমনকী জেল থেকেই পরিচালনা করে আমান একটি দলকে সিরিয়ায় যুদ্ধে পাঠিয়েছিল। এই মুহূর্তে ইন্দোনেশিয়ায় আই সিসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সে। আমান কতটা কট্টর বোঝা যাচ্ছে আবু বকর বসিরের সঙ্গে তার সম্পর্কচ্ছেদে। ২০০২ সালে বালিতে একটি বিস্ফোরণের ঘটনার মূল চক্রী বসির, যে বিস্ফোরণে দু'শোজন নাগরিকের মৃত্যু হয় এবং বসিরকে ফাঁসি দেওয়া হয়। এহেন বসির আমান 'হার্ড লাইনা'র এই অভিযোগে তার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে। সিরিয়ায় কোণঠাসা হওয়ার পর জেহাদি আইসিসের গন্তব্য কি এখন ইন্দোনেশিয়া? প্রশ্নটা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

প্রতিবাদী মরাঠাদের পাশে মহারাষ্ট্র সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত এক মাস ধরে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক মরাঠারা সংরক্ষণের দাবিতে মিছিল মিটিং করছিলেন। সম্প্রতি তাদের দাবি মেনে নিয়েছে মহারাষ্ট্র সরকার। একটি বিশেষ প্যানেলের সুপারিশকে মান্যতা দিয়ে সরকার জানিয়েছে, মরাঠারা সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়েছেন। মরাঠা সমাজে শিক্ষিতের সংখ্যাও বিপজ্জনকভাবে কমছে। তাই চাকরি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে মরাঠাদের সংরক্ষণের আওতায় আনা হবে। উল্লেখ্য, সমগ্র মহারাষ্ট্র জুড়ে মরাঠাদের সামাজিক, শিক্ষাগত এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে একটা সমীক্ষা করেছিল মহারাষ্ট্র স্টেট ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস কমিশন। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ বলেন, 'আমরা কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করেছি।' সরকারি সূত্রের খবর, মহারাষ্ট্র বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে শিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রে মরাঠাদের সংরক্ষণ নিয়ে একটি বিল আনা হবে।

শতবর্ষে অতিক্রান্ত চলচ্চিত্র অভিনেত্রী

পদ্মাদেবী

দিলীপ পাল

অসংখ্য চলচ্চিত্রে যিনি তাঁর আকর্ষণীয় অভিনয় প্রতিভা দিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন, তিনি হলেন পদ্মাদেবী।

উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক অবনীশ মিত্র বিদেশ থেকে ফিরে এসে বিয়ে করলেন হরিপদ দত্তের ছোটো বোন সুলেখাকে। সুলেখার বড় বোন লাবণ্য ও ভগ্নিপতি এলাহাবাদ হাইকোর্টের ব্যারিস্টার প্রশান্ত ঘোষ অবশ্য সেই বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন না। এখন লাবণ্যদের ইচ্ছা অবনীশ-সুলেখা তাঁদের মধুচন্দ্রিমা এলাহাবাদ এসে কাটিয়ে যাক। এলাহাবাদ থেকে হরিপদবাবু প্রশান্তের কাছ থেকে চিঠি পান একটি বাঙ্গালি ড্রাইভার পাঠানোর জন্যে। বিশেষ এক কারণে সুলেখাকে একা পাঠালেন অবনীশ। হরিপদবাবুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে অবনীশ গৌর নাম নিয়ে ড্রাইভার সেজে হাজির হলেন প্রশান্তের বাড়িতে। সুলেখা সুন্দরী একা গেলেন দিদি জামাইবাবুর কাছে। সুলেখা ড্রাইভার গৌরের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করেন। এটি অপছন্দ করেন প্রশান্ত। অথচ সুন্দরী শ্যালিকাকে চটাতেও পারেন না। সুলেখার ঘরে পোড়া সিগারেট, সুলেখার জানলার ছিঁটকিনিতে সুতো বেঁধে সঙ্কেত পাঠানো সবই নজরে পড়ল প্রশান্তের। অস্বস্তিতে পড়লেন প্রশান্ত ও লাবণ্য। সুলেখাকে গৌরহরির পাশে বসে গাড়ি চড়তে দেখে অস্বস্তি চরমে ওঠে। হঠাৎ সুলেখা ও গৌরহরি গৃহত্যাগ করে। দিদির কাছে চিঠিতে সুলেখা জানিয়ে যান গৌরহরির প্রতি তার দুর্বলতার কথা। এতক্ষণে পাঠকেরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে, এই গল্পটি হলো 'ছদ্মবেশী' ছবির। হ্যাঁ, ঠিকই। তবে বিভিন্ন চ্যানেলের দৌলতে যে 'ছদ্মবেশী' ছবিটি

দেখে দেখে আপনাদের মুখস্থ হয়ে গেছে, সেই ছদ্মবেশী (উত্তম-মাধবী)-র কথা আপাতত বলছি না। তবে এখন বলছি আগের 'ছদ্মবেশী'র কথা। এটি নির্মিত হয়েছিল ১৯৪৪ সালে। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত সেই 'ছদ্মবেশী' ছবিটির পরিচালক ছিলেন অজয় ভট্টাচার্য। সেখানে অধ্যাপক অবনীশ মিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন জহর গাঙ্গুলি। সুলেখার চরিত্রে রূপদান করেছিলেন পদ্মাদেবী। সুন্দরী এবং সুঅভিনেত্রী 'সুলেখা' চরিত্রের হাস্যলাস্য দুষ্টুমি পদ্মাদেবী অসাধারণ ভাবে চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছিলেন। আর জহর গাঙ্গুলি-পদ্মাদেবীর জুটি 'ছদ্মবেশী' ছবিকে সেই সময়ে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে নিয়ে যায়।

সেই পদ্মাদেবীর জন্ম আজ থেকে একশো বছরেরও অধিক অর্থাৎ ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে। পিতার নাম শতাকী ভট্টাচার্য। মাত্র নয় বছর বয়সে বিয়ে হওয়ার জন্য পড়াশুনা করতে পারেননি। এত অল্প বয়সে বিবাহ বলে কথা। ইঞ্জিনিয়ার স্বামীর সঙ্গে সাত বছর ধরে ঘর করার পর হঠাৎ তাঁর স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে যান। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁকে পাওয়া গেল না। অথৈ জলে পড়েন পদ্মাদেবী। তাঁর দু-দু'টি সন্তানকে মানুষ করার জন্য তিনি অভিনেত্রী জীবনকেই বেছে নিলেন। প্রথম যে ছবিতে তিনি অভিনয় করেন সেটি কিন্তু হিন্দি ছবি। ছবির নাম 'বীর কেশরী'। ছবিটি ১৯৩২ সালে মুক্তি লাভ করে। আর প্রথম বাংলা ছবি 'চাঁদ সওদাগর'। এ ছবিটি মুক্তিলাভ করেছে ১৯৩৪ সালে। ছবির পরিচালক ছিলেন প্রফুল্ল রায়। তবে সবার নজরে পড়েন প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত 'শাপমুক্তি' (১৯৪০) ছবিতে। সেখানে তিনি পুরোপুরি নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। তাঁর বিপরীতে নায়ক নবাগত রবীন মজুমদারের গাওয়া গান 'বাংলার বধূ বুকে তাঁর মধু', 'শাপমুক্তি' ছবিটিকে খুবই আকর্ষণীয় করে তুলেছিল।

তারপর আর পদ্মাদেবীকে পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি। নায়িকার ভূমিকাতেই হোক অথবা চরিত্রাভিনয়েই হোক, তিনি তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অভিনীত বেশ কিছু ছবির নাম অনায়াসে করা যায় যেখানে পদ্মাদেবীর অভিনয় আলাদা মাত্রা যোগ করেছে। কণ্ঠহার, পথের শেষে, জীবন সঙ্গিনী, খাসদখল, দেবদাসী, তুলসীদাস, তরুবালা, মহানিশা, শেষরক্ষা প্রভৃতি ছবিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাংলার প্রায় সব বিখ্যাত পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছেন পদ্মাদেবী। যেমন প্রমথেশ বড়ুয়া, নরেশ মিত্র, সুশীল মজুমদার, অগ্রদূত, তপন সিনহা, সত্যজিৎ রায়, সুবোধ মিত্র, দিলীপ বসু, যাত্রিক, অগ্রগামী, তরুণ মজুমদার, সুবোধ মিত্র প্রমুখ।

অভিনয় জীবনে পদ্মাদেবী প্রচুর কাজ করার সুবাদে অনেকগুলি ভাষা শিখেছিলেন। ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু, তেলুগু, পাঞ্জাবি ভাষাগুলি শিখেছিলেন। ভারতের প্রথম রঙিন ছবি হলো ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোম্পানির 'কিষাণ কন্যা', এ ছবির নায়িকা ছিলেন পদ্মাদেবী। এছাড়া বেশ কিছু ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন।

১৯৮৩ সালের ৩১ জানুয়ারি মাত্র ৬৬ বছর বয়সে পদ্মাদেবী আমাদের ছেড়ে চলে যান পরলোকে।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

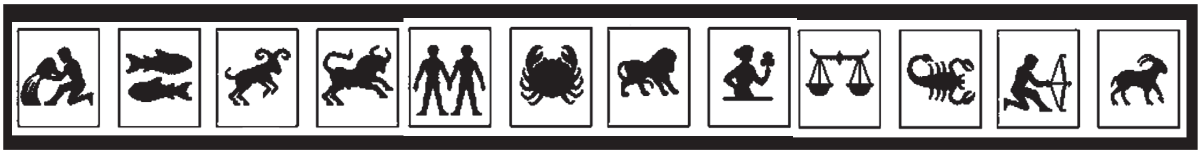

২৬ নভেম্বর (সোমবার) থেকে ২ ডিসেম্বর (রবিবার) ২০১৮। সপ্তাহের প্রারম্ভে কর্কটে রাহু, তুলায় শুক্র, বৃশ্চিকে রবি-বৃহস্পতি, ধনুতে বক্রী শনি, মকরে কেতু, কুম্ভে মঙ্গল। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র মিথুনে অরুদ্র নক্ষত্র থেকে কন্যায় পুষ্যা নক্ষত্রে।

মেষ : পেশাগত কর্ম ও শৌখিন ব্যবসায় উন্নতি। আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি, কর্মসূত্রে দূরদেশ যাত্রা। সদুপায়ে অর্জিত অর্থে জনকল্যাণমূলক কর্মে গুণীজনের সান্নিধ্য ও দেবীর কৃপালাভ। বিদ্যার্থীর মনোসংযোগ অক্ষুণ্ণ থাকবে। প্রযুক্তিবিদ, গবেষক, ইলেকট্রনিক ও নিউট্রিশিয়ানের কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি। সুন্দর ও বর্ণময় জীবন। সপ্তাহের শেষভাগে অধ্যবসায় ও সংযমী ভাব প্রাধান্য পাবে।

বৃষ : হঠাৎ ভ্রমণের যোগ। সন্তান যোগ। মানবিক গুণের প্রকাশ ও সামাজিক সখ্য বৃদ্ধি। গৃহ নির্মাণ, দালালি ও প্রমোটিং ব্যবসায় নতুন উদ্যোগের বাস্তবায়ন। নিজ পছন্দে বিবাহের যোগ। অহেতুক ক্রোধ ক্ষতির কারণ। সপ্তাহের প্রান্তভাগে গৃহসুখ বিনষ্ট, রোগভোগ ও ভৃত্য বিবাদ।

মিথুন : আত্মীয় কুটুম্ব সহ বিভিন্ন ব্যঞ্জনের সমাহার, চটুল কথাবার্তায় বিরোধিতা হ্রাস। আয়ের শ্লথ গতি সত্ত্বেও গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। গুরুজনের আশীর্বাদ লাভ। অলংকার ও বস্ত্র লাভ। বিদ্যায়, কৃষিকাজে সাফল্য। ভালো সুহৃদের সঙ্গলাভে মানসিক প্রশান্তি।

কর্কট : শরীরের যত্নের প্রয়োজন, সঠিক চিকিৎসায় বিঘ্ন। বিশেষত শরীরের মধ্যাঙ্গের। সপ্তাহের শেষভাগে কর্মলাভের সম্ভাবনা। জ্ঞান, বুদ্ধি ও কৌশলে শিক্ষার বাস্তবায়ন। গুরুজন ও দেব-দ্বিজে ভক্তি। গবাদি পশু এবং কৃষিজ ফসলে লাভ। পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয়। নিকট ভ্রমণ এবং ঋণ বৃদ্ধি।

সিংহ : পারিবারিক অসুস্থতায় জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ বিঘ্নিত হবে। ভ্রাতা-ভগ্নির জ্ঞান ও কর্মে উন্নতি। খনিজ, চর্ম, পরিবহণ ও কাষ্ঠ ব্যবসায়ীর বিত্ত ও আভিজাত্য বৃদ্ধি। উচ্চশিক্ষায় প্রবাস ও গবেষণায় স্বীকৃতি লাভ। সপ্তাহের শেষভাগে প্রণয়ীর ভালোবাসা। ছিদ্রান্বেষী ও দুর্জন ব্যক্তি ক্ষতিকর হতে পারে।

কন্যা : সুস্থ শরীরে পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মে সুধীজনের সান্নিধ্য-শংসা ও জ্ঞানের বাস্তবায়ন। প্রতিষ্ঠানের প্রধান, শিক্ষক, অধ্যাপক, আইনজ্ঞ, কলাকুশলীদের বহুমুখী কর্মে যোগদান, বিদ্যার্থীদের উৎসাহ ক্রমহ্রাসমান ও অমনোযোগ পরিলক্ষিত হয়। গৃহকর্ত্রীর বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়াসে গৌরব বৃদ্ধি।

তুলা : দীপ্তিমান-ব্যক্তিত্বপূর্ণ প্রভুত্বপদে প্রতিষ্ঠিত। সামাজিক, রুচিবান, রসিক, সহনশীল, মর্যাদাপূর্ণ জীবন। পত্নীর সুকৃতি। ভালো সুহৃদ সম্পর্ক। বিলাসবহুল সুখী জীবন জ্ঞান, পাণ্ডিত্যকে মলিন করবে। ছলনাময়ীর সান্নিধ্যে কর্মে স্থানান্তর, বন্ধনযোগ।

বৃশ্চিক : প্রিয়জনের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনের সম্পর্কে উৎসাহ বৃদ্ধি। তীর্থ দর্শন, পিতার স্বাস্থ্যচিন্তা, দুর্বল শ্রেণীর প্রতি মমত্ববোধ, বিদ্যার্থীর বিশেষত ডাক্তারি, মেকানিকাল, বিউটিশিয়ানদের সন্তোষজনক অগ্রগতি। কর্মে সুখ্যাতি, গুরুজনের পরামর্শে সুপ্রসন্ন ভাগ্য। অহেতুক সমালোচনা ও পেটের চিকিৎসায় সতর্ক থাকা দরকার।

ধনু : প্রতিবেশী, ভ্রাতৃস্থানীয়ের আর্থিক বিষয়ে প্রতিকূল সময়। অভিমান, উদ্বিগ্নতায় বিষণ্ণ মন। হতাশার মহাসমুদ্র থেকে জ্ঞান, বুদ্ধি, ন্যায়পরায়ণ, বৈষয়িক উন্নতি, সামাজিক স্বীকৃতি ও সৃষ্টির আনন্দে উজ্জীবিত। সপ্তাহের শেষভাগে বিত্ত ও অভিজাত্য গৌরব।

মকর : সপ্তাহটি ত্রিবেণীর গঙ্গা-যমুনার সাদা-কালো মিশ্রিত জীবন। জেদ, কর্কশ কথাবার্তা, আর্থিক সংকট ও নিন্দা সমালোচনায় ধৈর্য্য ও সংযমী হওয়া প্রয়োজন। সপ্তাহের শেষ ভাগে হতাশার অমানিশার অবসানে উদ্যমী, ভ্রাতা-ভগ্নির উন্নতি ও সার্বিক স্বাচ্ছন্দবোধ। গৃহসুখ, ভ্রমণ।

কুম্ভ : পারিবারিক অসুস্থতা ও অন্ত্যজ শ্রেণীর জন্য উদ্বেগ। শারীরিক ক্লান্তি সত্ত্বেও মাতৃসুখ ও ভাগ্যোন্নতি যোগ, শিক্ষক অধ্যাপক, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এম ডি, চিকিৎসক, উকিল, সার্ভেয়ারের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, যশ ও খ্যাতি। উদ্যম মননশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা ও সৌন্দর্য সুধায় জীবনের নব অধ্যায়ের সূচনা। ব্যবসায় বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ।

মীন : ভরণীয়বর্গের কর্তব্য পালন, বিবাহ অনুষ্ঠান, পৈতৃক ব্যবসায় শুভ। সন্তানের আইনি জটিলতায় সতর্ক থাকা দরকার। শত্রু মিত্রতে পরিণত হবে। ঝুলে থাকা সমস্যার সমাধান হতে পারে। বিদ্যার্থীর আবেগপ্রবণ মন ও আকাশ কুসুম কল্পনায় সময়ের অপচয়।

● জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।

—শ্রী আচার্য্য